এপ্রিল ১৯৮৯
চৈত্র ১৩৯৫

সন্দেশ

সম্পাদনা
লীলা মজুমদার
নলিনী দাশ
সত্যজিৎ রায়

দেবজ্যোতি
ধু লো খে লা
অতীতের সাগর সেঁচে মনি মানিক্যের সন্ধান
Please visit : http://dhulokhela.blogspot.in/
পড়ুন ও আমাদের
সংরক্ষনে সাহায্য করুন

১৩৯৬ সালের সন্দেশের দাম ও চাঁদার হার

কাগজের দাম, ডাক মাশুল এবং ছাপার ও অন্যান্য সমস্ত খরচ অনেক বেড়ে গেছে তাই আমরা বৈশাখ ১৩৯৬ থেকে সন্দেশের দাম কিছুটা বাড়াতে বাধ্য হচ্ছি। প্রতি সংখ্যা ৫·০০, শারদীয়া ২৫·০০।

বার্ষিক সডাক ৫৫·০০, শারদীয়া হাতে নিলে ৫০·০০, সব হাতে নিলে ৪৫·০০

প্রতি বাংলা মাসের মাঝামাঝি, ইংরাজী মাসের প্রথমে সন্দেশ প্রকাশিত হয় এবং Under Certificate of Posting পাঠান হয়।

ইংরেজি মাসের তৃতীয় সপ্তাহেও বই না পেলে লিখিত নালিশ জানালে ডুপ্লিকেট দেওয়া হয়।

সন্দেশের চাঁদা মানিঅর্ডারে, নগদে অথবা 'চেকে' পাঠান যায়। Sandesh নামে চেক লিখবেন, মফঃস্বলের চেক দিলে ভাঙ্গাবার খরচ আট টাকা লাগবে। পোস্টাল অর্ডার নেওয়া হয় না।

গ্রাহক-গ্রাহিকারা চিঠিপত্র, ধাঁধার উত্তর, লেখা, ছবি ইত্যাদি পাঠাবার সময়ে গ্রাহক নম্বর, নাম ঠিকানা ও বয়স স্পষ্ট করে লিখবে। সন্দেশ পাঠাবার সময়ে নামের বাঁ পাশে গ্রাহক সংখ্যা লিখে দেওয়া হয়। গ্রাহক স্কুল, ক্লাব বা লাইব্রেরির প্রতিটি ছাত্র/মেম্বার গ্রাহক। ব্যক্তিগত উত্তর চাইলে জোড়া পোস্ট কার্ড লিখতে হবে।

লেখকেরা স্বনামাঙ্কিত পোস্টকার্ড দিলে ফলাফল জানানো হবে। উপযুক্ত টিকিটযুক্ত খাম না দিলে অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া হবেনা। কোন মাসে লেখা পাঠানো হয়েছিল সঠিকভাবে না জানালে ফলাফল জানানো সম্ভব নয়। আলগা টিকিট পাঠাবেন না।

হাতে নিলে পাঁচ, ডাকে নিলে পনের কপির কমে এজেন্সি দেওয়া হয় না। আমরা নিজব্যয়ে মফঃস্বল এজেন্টকে পত্রিকা পাঠাব কিন্তু ফেরত দেবার ডাক খরচ এজেন্টকে দিতে হবে। বেলে ফেরত নেওয়া হয় না। ৫-৯৯ কপিতে ২৫%, ১০০—৩৩·৩৩% কমিশন।

বিজ্ঞাপনদাতারা অনুগ্রহ করে ছয় সপ্তাহ আগে ব্লক, আর্টপুল, পাণ্ডুলিপি পাঠাবেন।

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি—আনন্দ ঘোষ

সন্দেশ কার্যালয়—১৭২/৩, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯ ফোন : ৪৬-৪৯১৯
নিউস্ক্রিপ্টের দোকান—এ-১৪, কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলিকাতা ৭০০০০৭

পাতিরাম বুক স্টল কলেজ স্ট্রীট জংশন	নবীন বর্মন টাইমস অব ইণ্ডিয়া ও হাওড়া এলাকায়	প্রশান্ত নন্দী গড়িয়াহাট বিপনি গড়িয়াহাট মোড়	অবনী দেয়াসী হাজরা মোড়

শ্যামল ভট্টাচার্য ৭৭ মহাত্মা গান্ধী রোড কলি-৯ (টেমার লেনের মুখে)	পাত্র বুক ষ্টল	রসরাজ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট	সুশীল দত্ত শ্যামবাজার

হাওড়া, শিয়ালদহ ও অন্যান্য বড় বড় রেলওয়ে ষ্টেশনে হুইলার বুক ষ্টল

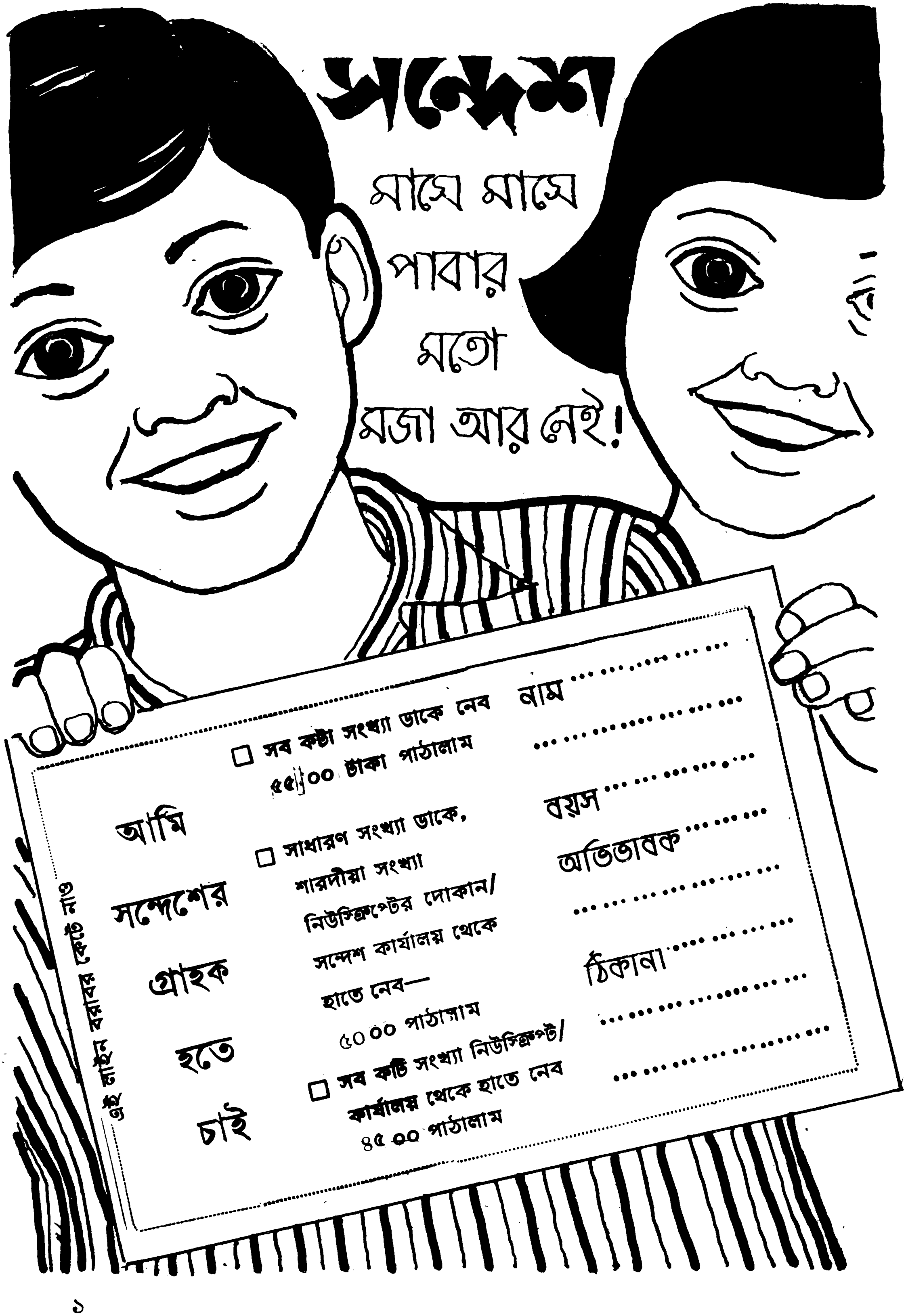

সন্দেশ
মাসে মাসে
পাবার
মতো
মজা আর নেই!
আমি
সন্দেশের
গ্রাহক
হতে
চাই
□ সব কটা সংখ্যা ডাকে নেব
৫৫.০০ টাকা পাঠালাম
□ সাধারণ সংখ্যা ডাকে,
শারদীয়া সংখ্যা
নিউস্ক্রিপ্টের দোকান/
সন্দেশ কার্যালয় থেকে
হাতে নেব—
৫০.০০ পাঠালাম
□ সব কটি সংখ্যা নিউস্ক্রিপ্ট/
কার্যালয় থেকে হাতে নেব
৪৫.০০ পাঠালাম
নাম
বয়স
অভিভাবক
ঠিকানা

সন্দেশ

গ্রাহক সংগ্রহ প্রতিযোগিতা

ডুডুম্-ডুম্। ডুডুম্-ডুম্। ডুডুম্-ডুডুম্-ডুম্
শোনো-শোনো 'সন্দেশী'গণ তাড়িয়ে চোখের ঘুম।
সবাই মিলে কোমর বেঁধে সেজেই যে যার সাজে
উঠে-প'ড়েই লাগো গ্রাহক যোগাড় করার কাজে ॥

কাছের-দূরের গ্রাহক-পাঠক **'সন্দেশী'** বোন-ভাই
অনেক-অনেক নতুন-গ্রাহক যোগাড় করা চাই!
এইবারে সব এক থেকে দশ আঙুলের গাঁট গুনে
প্রতিযোগিতার **'নিয়ম-কানুন'** মন দিয়ে নাও শুনে ॥

প্রতিযোগিতার নিয়মাবলী

এক নম্বর, নতুন গ্রাহক চাই যে যোগাড় করা
চলতি-গ্রাহক এই হিসাবে হবে না ভাই ধরা।

দুই নম্বর, তিনটি গ্রাহক করবে যারাই ভাই
সবাই পাবে 'প্রাইজ' তারা চিন্তা কিছুই নাই ॥

তিন নম্বর, যত গ্রাহক আনবে যারা ধ'রে
গ্রাহক-পিছু মিলবে তাদের ঠিক দু'-টাকা ক'রে।

চার নম্বর, দশটি গ্রাহক করতে যদি পারো
তার উপরেও পাঁচটি টাকা মিলবে 'ইনাম্' আরো ॥

পাঁচ নম্বর, একটি আছে **'বিশেষ পুরস্কার'**
সবচেয়ে যে বেশি গ্রাহক করবে যোগাড় তার।

ছয় নম্বর, যাও লেগে সব সময়-সুযোগ দেখে
চাঁদা পাঠাও পুরস্কারের প্রাপ্য কেটে রেখে ॥

সাত নম্বর, নতুন গ্রাহক করবে যাদের ভাই
নাম-ঠিকানা-বয়স তাদের সঙ্গে দেওয়া চাই।

আট নম্বর, সংগ্রাহকের নামটি লিখো সাথে
মোট কতজন করলে গ্রাহক, জানিয়ে দিও তাতে ॥

নয় নম্বর, হিসাব যদি যায় হারিয়েই পাছে
সবাই যে যার হিসাব সদাই রাখবে নিজের কাছে।

দশ নম্বর, বলছি শোনো, ভাই—বন্ধু—দাদা
প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে নেই বয়সের বাধা।
কিশোর-যুবক কিংবা বুড়ো, বয়স কম বা বেশী
আমরা তো কেউ 'ভিন্-দেশী' নয়, সব্বাই **'সন্দেশী'** ॥

এখনই গ্রাহক হয়ে যাও

আমি সন্দেশের গ্রাহক হতে চাই

নাম.................................বয়স........

অভিভাবকের নাম.................................

ঠিকানা ....

....

বন্ধুদের গ্রাহক কর

আমি ....কে গ্রাহক করতে চাই

গ্রাহকের নাম .... বয়স..........

ঠিকানা.................................. ....

....

সংগ্রাহকের নাম...................................

ঠিকানা ....

চৈত্র ১৩৯৫

সন্দেশ

ছেলেমেয়েদের সচিত্র মাসিকপত্র

এপ্রিল ১৯৮৯

লীলা মজুমদার, নলিনী দাশ

ও সত্যজিৎ রায় সম্পাদিত

গল্প

অপমানের শোধ / উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ১০৫৬
হাসির গল্প/উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ১০৫৮, ১০৬১
সূর্যের সাজা / উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ১০৫৯
ঊনিশ ধাপের দিন / সলিল চট্টোপাধ্যায় ১০৬২
গ্রেফ্রায়ার্স ববি / অরুণ কুমার দত্ত ১০৬৮
দুলিয়া ও বুনো হাতি / তপন কুমার চৌধুরী ১০৭১
জেমস / তাপস কুমার ১০৮৬
বিচার / রাধিকা রঞ্জন চক্রবর্তী ১০৯৩
আমার জন্মদিন / দেবপ্রসাদ মিত্র ১১০২
পড়াশুনার গাল গল্প / প্রদীপ পারেখ ১১০৬

প্রবন্ধ

বনের খবর / প্রমদারঞ্জন রায় ১০৭৪
জানোয়ারের বন্ধুতা / উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ১০৮২
শুকপাখী / উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ১০৮৪
শাইলকের শহরে / ইন্দ্রাণী হালদার ১০৮৮
জয়পুরের মানমন্দির / নিরঞ্জন সিংহ ১০৯৭

কমিক স্ট্রিপ

টোটোর অ্যাডভেঞ্চার / গল্প-নলিনী দাশ, ছবি—প্রশান্ত ১০৭৮

ছড়া ও কবিতা

বনের স্বপ্ন / অরুণিমা রায়চৌধুরী ১০৫৫
নূতন ধাঁধা / অহিভূষণ চৌধুরী ১০৬৭
সত্যি সত্যি / করুণাময় বসু ১০৭০
হ্যাটট্রিক / আশিস কুমার মুখোপাধ্যায় ১০৭৩
হাসি কান্না-হীরে পান্না / ভবানীপ্রসাদ মজুমদার ১০৮৭
কি আর তফাৎ / সুনীতি মুখোপাধ্যায় ১০৯৬
চোর আর মামদো / অমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায় ১১০৫
গল্প সল্প / লীলা মজুমদার ১১০৮

চিঠিপত্র ১১০৯
ধাঁধা ও প্রতিযোগিতার ফলাফল ১১১০
কালাচাঁদ-বনাম-পাগলা দাশু ১০৯২
শর্মিলা স্মৃতি পুরস্কার প্রতিযোগিতা ১১০৭
প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর / জীবন সর্দার ১১১১
খেলাধুলা / শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ১১১৩
হাত পাকাবার আসর ১১১৯

শাইলকের শহরে / ইন্দ্রাণী হালদার

সন্দেশ

ছেলেমেয়েদের সচিত্র মাসিকপত্র

চৈত্র ১৩৯৫

এপ্রিল ১৯৮৯

বনের স্বপ্ন

অরুণিমা রায়চৌধুরী

তোমরা তো বেশ দল বেঁধে সব দেখতে আসো আমায়।
আমার হাসি-কান্না নিয়ে কেই বা মাথা ঘামায়?
সামনে খাবার ধরে দিলেও থাকা কি যায় সুখেই?
দেখতে কি পাও কত সময় স্রেফ্ রেখে দিই শুঁকেই?
একটু নকল পাথর, গুহা, ঝোপ-জঙ্গল পাহাড়,
ঠিকেদারের জোগান দেওয়া কাঁচামাংসের আহার,—
ভাবছ এতেই ভুলিয়ে দেবে দুঃখ আমার মনের?
এর সাথে কি তুলনা হয় দূর সে সবুজ বনের?
গহন বনের যে গান বাজে বন-তিতিরের ডানায়,
শোনাতে কি পারবে সে গান এই চিড়িয়াখানায়?
লতায়-পাতায় কোলাকুলি, গাছের ডালে ডালে
কাঠবিড়ালীর তুরুক্-নাচন আড়ালে আবডালে,
কাছ ঘেঁষে মা'র, হরিণ ছানার টানা চোখের চাওয়া,—
নরম কচি মাংসে হাড়ে জমত কেমন খাওয়া!
কত্তা-গিন্নী, ছানা-পোনা সবাই মিলে মিশে,
ভাগ করে যে খাওয়ার মজা,—তোমরা বোঝো কি সে?
তোমরা জানো খাবার নিয়ে কেবল কাড়াকাড়ি,
একরত্তি দেয়াল ঘেরা ইঁটপাথরের বাড়ি।
একটু 'হালুম' শোনার জন্যে লাঠি দিয়ে খোঁচাও,
সাধ্য কি এই দুচোখ থেকে বনের স্বপ্ন মোছাও?

অপমানের শোধ

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

কুচবিহারের রাজসভায় মন্ত্রী ও অমাত্যগণ নিজ নিজ আসনে বসিয়া আছেন, মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণ আসিলেই সভার কাজ আরম্ভ হইবে। এমন সময় পণ্ডিত মুকুন্দরাম সার্বভৌম আসিয়া রাজার সিংহাসনের পাশে বসিয়া গেলেন। মুকুন্দ সার্বভৌম অসাধারণ পণ্ডিত এবং মহৎ লোক, তিনি কোন রাজার সিংহাসনের পাশেই বসিবার অযোগ্য নহেন, কিন্তু রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের তাঁহাকে সেখানে দেখিয়া বড়ই রাগ হইল, তিনি দুই চক্ষু লাল করিয়া বলিলেন, 'ঠাকুর! তুমি রাজাসনের কাছে বসিবার যোগ্য নও।'

ইহাতে মুকুন্দ সার্বভৌম যারপর নাই অপমান বোধ করিয়া সেখান হইতে চলিয়া আসিলেন। তেজস্বী লোক অনেক ক্ষতি সহ্য করিতে পারে, কিন্তু অপমান সহ্য করিতে পারে না। মুকুন্দও সেই অপমান সহিতে না পারিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে রাজাকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিতে হইবে।

সে সময়ে দিল্লীর বাদসাহ ছিলেন নুরউদ্দীন মহম্মদ জাহাঙ্গীর সাহ। তিনি হিন্দুর দৌহিত্র ছিলেন বলিয়া ব্রাহ্মণ মাত্রের প্রতি তাঁহার অতিশয় শ্রদ্ধা ছিল। বিশেষতঃ মুকুন্দ সার্বভৌমকে তিনি দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতেন।

মুকুন্দ পণ্ডিত লক্ষ্মীনারায়ণের নিকট অপমান পাইয়া সেই বাদসাহের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। বাদসাহ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'পণ্ডিতজী, আপনার কি চাই?' মুকুন্দ বলিলেন, 'আমি রাজাসনের নিকটে বসিয়াছিলাম, সেজন্য আমার দেশের রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ আমাকে অপমান করিয়াছেন। আপনি যদি তাঁহাকে এখানে আনাইয়া, তাঁহার চক্ষের সামনে আপনার সিংহাসনের নিকটে আমাকে বসিতে দেন, তবে আমার দুঃখ দূর হয়।'

তখনই লক্ষ্মীনারায়ণকে দিল্লীতে পাঠাইবার জন্য গৌড়ের শাসনকর্তার বরাবরে হুকুম গেল। শাসন কর্তাও সে হুকুম পাইয়া কুচবিহার রাজ্য লণ্ডভণ্ড করিতে আর বিলম্ব করিলেন না। লক্ষ্মীনারায়ণ দেখিলেন, দিল্লী না গেলে রাজ্যই যায়। সুতরাং নিতান্ত নিরুপায় হইয়া তাঁহাকে সেখানে যাইতে রাজী হইতে হইল। তখন আর গৌড়ের শাসনকর্তারও তাঁহাকে জ্বালাতন করিবার কোনো প্রয়োজন রহিল না।

তারপর কিছুদিন গিয়াছে, মহারাজ দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া বাসা লইয়াছেন, সঙ্গে আসিয়াছেন রাজকুমার বজ্রনারায়ণ আর ভীমনারায়ণ। বাদসাহের সঙ্গে এখনও সাক্ষাৎ হয় নাই, সেই অবসরে মহারাজ নগরের শোভা দেখিয়া বেড়াইতেছেন। একটা সরু গলি, তাহার দুধারে বড় বড় বাড়ি। বেড়াইতে বেড়াইতে সেই পথে আসিয়া মহারাজ এক ক্ষ্যাপা হাতীর সামনে পড়িলেন। গলির ভিতর দিয়া হাতীটাকেই তাহার রক্ষকেরা অতি কষ্টে লইয়া আসিতেছে, তাহার পাশ দিয়া আর কাহারও গলিয়া যাইবার স্থান একেবারেই নাই। মাহুত মহারাজকে বলিল 'হটিয়া যাও!' মহারাজ বলিলেন, 'তোমার হাতী হটাইয়া নেও!'

দুষ্ট মাহুত একথায় মহারাজ এবং কুমারদিগের উপর দিয়াই হাতী চালাইয়া নিবার আয়োজন করিল। তখন মহারাজ বলিলেন, 'বাবা বজ্রনারায়ণ, দেখত বেটার আস্পর্দ্ধা!' অমনি বজ্রনারায়ণ হাতীর দুই দাঁত ধরিয়া এমনি ঠেলা দিলেন যে সে চ্যাঁচাইতে চ্যাঁচাইতে তখনই হটিয়া গেল। তখন আর মহারাজের চলিবার কোন বাধা রহিল না।

এদিকে হাতীর মাহুত তখনই গিয়া বাদসাহের দরবারে এই ঘটনার সংবাদ জানাইয়াছে। বাদসাহ তাহার কথায় যারপর নাই আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, 'এমন মহাবীর না জানি কোথা হইতে

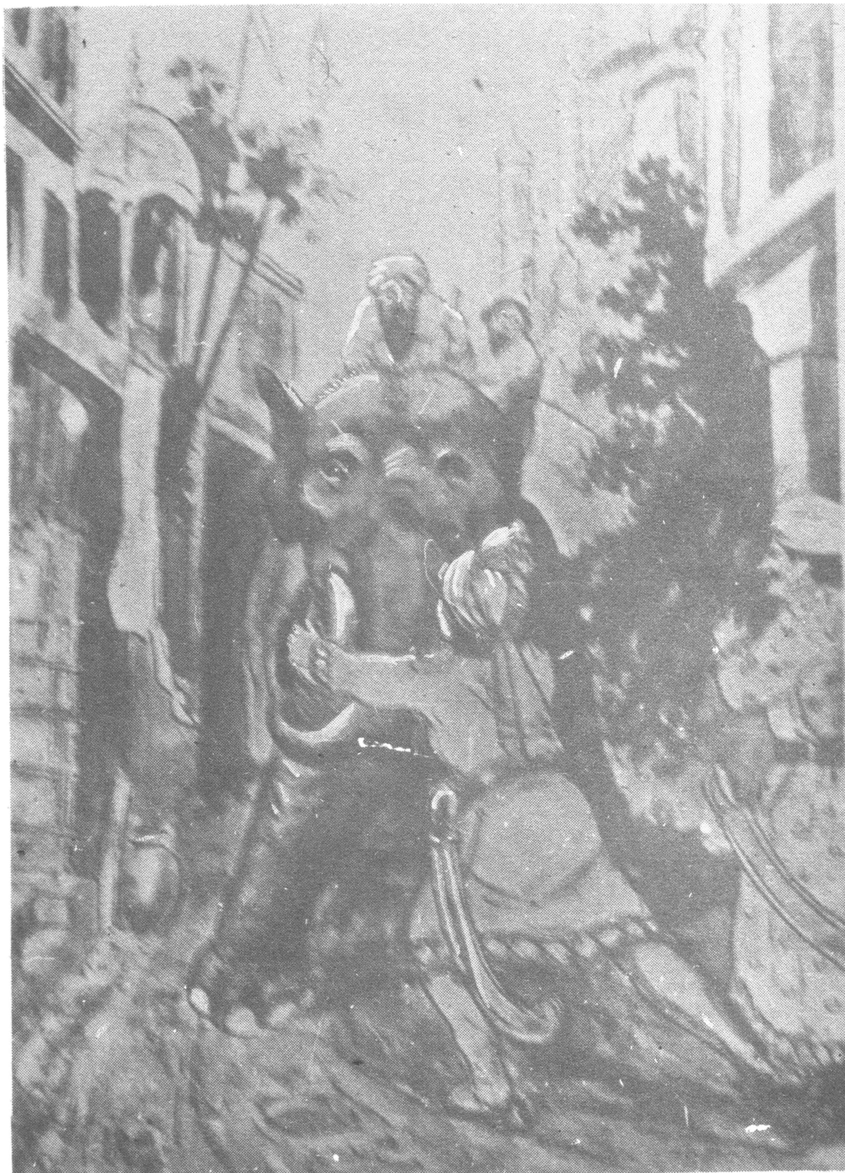

আসিয়াছে !' সেখানে মুকুন্দ সার্বভৌম উপস্থিত ছিলেন, তিনি বলিলেন,' বিশ্ব সিংহের (মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের পূর্বপুরুষ) সন্তান ছাড়া এমন বীর আর কোথায় সম্ভবে ? নিশ্চয় মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণ এখানে আসিয়াছেন ।'

আর একদিন মহারাজ যমুনায় নামিয়া তর্পণ করিতেছেন, এমন সময় বিশাল এক ষোল-দাঁড়ী পান্সী আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। মাল্লারা রাজাকে ধমকাইয়া বলিল 'ঘাট ছাড়িয়া দাও !' মহারাজ আর রাজকুমারেরা, তাহাদিগকে মিষ্ট কথায় বুঝাইয়া বলিলেন, 'ভাই, নৌকাখানা একটু পাশের দিকে ভিড়াও না।' মাল্লাগুলি এমনি দুর্জ্জন, তাহারা সে কথায় কান দিবে না, তাহারা মহারাজের উপর দিয়াই নৌকা চালাইয়া নিবে। তখন ভীমনারায়ণ বুক পাতিয়া দিয়া পাহাড়ের মতন অচলভাবে সেই নৌকার সামনে গিয়া দাঁড়াইলেন ; নৌকা তাঁহার বুকের ধাক্কায় ঠিকরাইয়া পিছু হটিয়া গেল।

এমন লোককে দেখিতে ব্যস্ত না হইয়া কি বাদসাহ থাকিতে পারেন ? তিনি লক্ষ্মীনারায়ণকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু তাহাতেও আবার

একটু মুস্কিল দেখা দিল। লক্ষ্মীনারায়ণ যে তেজী পুরুষ, তিনিও কাহাকেও সেলাম করিবার লোক নহেন ; আবার তিনি সেলাম না করিলে বাদসাহেরও যে মান থাকে না ! ইহার উপায় কি হয় ? উপায় অতি চমৎকারই হইল। একটা খুব ছোট্ট দরজার সামনে বাদসাহকে বসান হইয়াছে, সেই দরজার ভিতর দিয়ে তাঁহার নিকট আসিতে হইবে ; কাজেই লক্ষ্মীনারায়ণের হেঁট হওয়া ভিন্ন আর গতি নাই। মুকুন্দ পণ্ডিতকে পাশে লইয়া বাদসাহ সেই ঘরে অপেক্ষা করিতেছেন, এখন লক্ষ্মীনারায়ণ আসিলেই হয়।

লক্ষ্মীনারায়ণ আসিয়াই দেখিলেন, ফন্দিটা হইয়াছে মন্দ নয়। তিনি তখন একটু থতমত খাইয়া যেই রাজকুমারদের পানে তাকাইয়াছেন, অমনি বজ্রনারায়ণ আসিয়া মাথায় ঠেলিয়া দরজার খিলান তুলিয়া ধরিলেন, মহারাজের আর হেঁট হওয়ার দরকার হইল না। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া বাদসাহ মনে ভাবিলেন যে ইঁহারা কখনও সামান্য মানুষ নহেন, নিশ্চয় দেবতা !

মুকুন্দ সার্বভৌম এতক্ষণ বাদসাহের সিংহাসনের পাশেই বসিয়াছিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণ ঘরে আসিতেই তিনি উঠিয়া স্নেহের সহিত তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, 'মহারাজ ! দিল্লীর বাদসাহ আমাকে তাঁহার সিংহাসনের পাশে বসিবার অযোগ্য মনে করেন না।'

যে লক্ষ্মীনারায়ণ জীবনে আর কখনও মাথা হেঁট করেন নাই, এইবারে লজ্জায় তাঁহার মাথা হেঁট হইল।

হাসির গল্প

উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী

একজন লোক আরেক জনকে বল্ল, 'আরে ভাই, টাকায় টাকা আনে।' সেইখান দিয়ে এক বোকা চাষা হাটে যাচ্ছিল, সে সেকথা শুনে ভাবল, 'আমার সঙ্গে ত একটা টাকা আছে। আচ্ছা, দেখি এটাতে আর টাকা আনতে পারে কিনা।' এই কথা ভেবেই সে অমনি এক পোদ্দারের দোকানে গিয়ে উপস্থিত হল ! পোদ্দার অনেক টাকা আর পয়সা ঢিপি করে দোকানে রেখে দিয়েছে, চাষাও গিয়ে সেই দোকানের জানালার উপরে তার টাকাটি রেখে দিয়ে দেখছে, তাতে পোদ্দারের টাকার কয়েকটা টেনে আনতে পারে কিনা। এমন সময় তার টাকাটি হাওয়ায় গড়িয়ে দোকানের ভিতরে পড়ে পোদ্দারের টাকার সঙ্গে মিশে গেল। তখন চাষা বেচারা আর কি করবে, সে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী চলেছে। খানিক দূর গিয়ে তার সেই লোকটির সঙ্গে দেখা হল, যে বলেছিল যে 'টাকায় টাকা আনে।' চাষা তাকে বল্ল, 'তোমার কথায় আর বিশ্বাস করব না, তুমি বড্ড মিথ্যা কথা বল।' সে লোকটি আশ্চর্য্য হয়ে বল্ল, 'কেন ভাই, আমি কি মিথ্যা কথা বল্লুম ?'

এ কথায় চাষা তাকে সব কথা খুলে বল্ল। তা শুনে সেই লোকটি বল্ল, 'আমি ত ঠিকই বলেছিলাম। সেই পোদ্দারের টাকা তোমার টাকাকে টেনে নিয়ে গেছে। ওর কিনা বেশি টাকা, কাজেই তার জোর বেশী।'

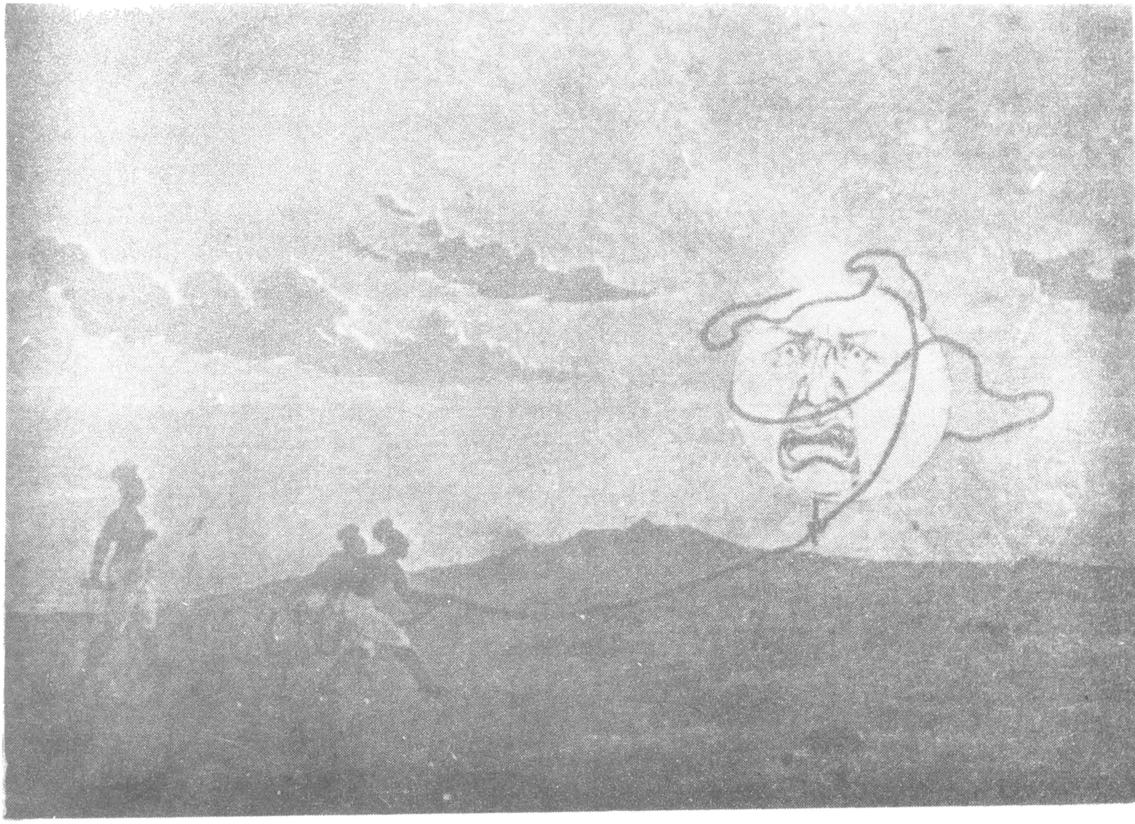

সূর্য্যের সাজা

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

সূর্য্যটা ভারী দুষ্টু! গরম এনে আমাদের কি কষ্ট দেয়। ওকে জব্দ করার কোন রকম ক্ষমতা যদি আমার থাকত, তবে আমি কখনো ওকে ছাড়তাম না। কেউ কখনো ওকে জব্দ করেছে এমন কথা শুনলে আমার বেশ লাগে। এমন কয়েকজন লোকের খবর আমি পেয়েছি। তাদের কথা শুনলে হয়তো তোমরাও খুসী হবে।

জব্দ করার মত জব্দ করেছিল দুজন লোক। তার একজন হচ্ছে হনূমান, আরেকজন মাউই। হনূমান গিয়েছিল গন্ধমাদন পর্বত থেকে লক্ষ্মণের জন্যে ওষুদ আনতে। রাবণ শক্তিশেল মেরে লক্ষ্মণকে অজ্ঞান করে ফেলেছে, রাত্রের মধ্যে ওষুদ নিয়ে ফেরা চাই, সূর্য্য উঠলেই লক্ষ্মণ মরে যাবেন। হনূমান তাই প্রাণপণে ওষুধ খুঁজছে, আর ভাবছে ভোর হবার ঢের আগেই ওষুদ নিয়ে পৌঁছে যাবে।

এদিকে রাবণ ভাবছে কিছুতেই রাত্রের ভিতরে হনূকে ওষুদ নিয়ে ফিরতে দেবে না। তখন রাত দুপুর হবে। সে সূর্য্যকে ডেকে হুকুম দিল, এখনই গিয়ে আকাশে উদয় হও। সূর্য্য মহাশয় রাবণের ভয়ে বড়ই জড়সড় থাকতেন। সে একবার এই বড় গদা নিয়ে তাকে ঠেঙাতে গিয়েছিল, তখন আগেভাগেই হার মেনে তার রাগ থামিয়েছিলেন। সে কথা তিনি ভুলতে পারেন নি। কাজেই হুকুম পাওয়া মাত্র প্রাণের ভয়ে ব্যস্ত হয়ে তিনি আকাশে উদয় হতে গেলেন।

হনূ ওষুদ খুঁজছিল। এমন সময় দেখল যে সূর্য্য ঠাকুরের গোল মুখখানি পাহাড়ের আড়াল থেকে উঁকি মারছে। হনূ তাতে ভারী আশ্চর্য হয়ে বলল, 'সে কি ঠাকুর? এত রাত্রে আপনি আজ কোথায় চলেছেন?' সূর্য্য বললেন 'আমি

উদয় হতে যাচ্ছি।' হনু যোড় হাতে তাঁকে মিনতি করে বলল, 'ঠাকুর গো! আপনার পায় পড়ি। এখনো ঢের রাত আছে; আপনি এখন উদয় হবেন না, তাহলে লক্ষ্মণ মরে যাবেন।' সূর্য্য তাতে চটে বললেন, 'সে হবে না বাপু! আমি এখনি উদয় হব!'

যেই একথা বলা, অমনি হনু তাঁকে ধরে বগলে পূরল তারপর ওষুদ নিয়ে লঙ্কায় ফিরে এসে সেই ওষুদে লক্ষ্মণকে ভাল হয়ে উঠে বসতে দেখে, তবে বগল থেকে তাঁকে বার করল। ততক্ষণে ঢের বেলা হয়ে গিয়েছিল।

এখন মাউইর কথা বলি। মাউই ছিল একজন মাওরী (Maori) এই জাতী নিউজিলণ্ড দ্বীপে থাকে।

মাউই ভয়ঙ্কর যাদু জানত, আর তার যে দিদিমা ছিল, সে জানত আরো বেশী। সেই বুড়ীর একেকখানা হাড়ের এমনি গুণ ছিল যে, তা দিয়ে যা খুসী তাই করা যেত। তাই মাউই একদিন তাকে বলল, 'দিদিমা, আমাকে একখানা হাড় দাও না!' অমনি বুড়ী নিজের চোয়ালের একখানা হাড় খুলে মাউইকে দিয়ে দিল। মাউই সে হাড় পেয়ে কি খুসীই হল! সে জানত যে তা দিয়ে ঠুকলে পাহাড়ও গুঁড়ো হয়ে যাবে।

সেটা গ্রীষ্মকাল, আর তখনকার সূর্য্যটি ছিল বেজায় গরম আর ভারী চঞ্চল। সে পূর্বদিকের এক কোণে উঁকি মেরেই অমনি বোঁ করে ছুটে আকাশ পার হয়ে যেত। আর ঐ টুকুর মধ্যেই সকলে গরমে পাগল হয়ে উঠত। এত গরমে কাজই বা কি করে করবে, তাতে আবার দেখতে দেখতে দিন ফুরিয়ে যায়, কাজ শেষই বা কেমন করে হবে?

মাউই বলল, 'সূর্য্যটাকে একটু পোষ না মানাতে পারলে আর চলছে না।'

সকলে সে কথা শুনে হাসল, কিন্তু মাউই তাতে ভয় পেল না। সে তার ভাইদের নিয়ে দিন রাত বসে খালি দড়ি পাকাতে লাগল। এমনি মোটা আর এমনি লম্বা দড়ি যে তেমন আর কেউ কখনো দেখেনি, আর সেই দড়িতে মাউই এমন মন্ত্র পড়ে দিল যে সূর্য্যের আগুনে আর তার কিছু হবে না।

তারপর সেই দড়ি নিয়ে তারা কভাই মিলে পৃথিবীর কিনারার দিকে রওয়ানা হল। সকল দেশ আর সকল সাগরের শেষে পৃথিবীর সেই কিনারা। সেইখানে রোজ ভোরের বেলা এসে সূর্য্য উঁকি মারে।

মাউই আর তার ভাইয়েরা দিনের বেলায় বনের ভিতরে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থাকে। রাত্রে যখন সূর্য্য থাকেনা তখন তারা চলে। কাজেই সূর্য্য তাদের দেখতেও পেলনা, কিছু টেরও পেল না। এমনি করে ত একদিন সূর্য্য উঠবার একটু আগে এসে তারা পৃথিবীর কিনারায় পৌঁছেছে। পৌঁছিয়েই মাউই তার ভাইদের বলল 'এইখান দিয়ে এসে উঁকি মারবে আর অমনি তোরা এই দড়ি দিয়ে আচ্ছা করে বেটাকে বাঁধবি। দেখিস ছাড়িস না যেন!

বলতে বলতেই সূর্য্য হাসতে হাসতে এসে সেইখান দিয়ে উঁকি মেরেছে। বেচারা কিছু জানে না, সে খালি ভাবছে এইবার বোঁ করে একটা ছুট দিবে। এমন সময় সেই সর্বনেশে দড়ি এসে হুড়মুড় করে তার মাথায় পড়ল আর তার সঙ্গে সঙ্গে মাউইর ভাইয়েরা ছুটে এসে তাকে এমন বাঁধনে বাঁধল যে কি বলব। তখন সূর্য্য ভয়ানক ছটফটিয়েছিল আর দাঁত খিঁচিয়েছিল আর চেঁচিয়েছিল বৈকি। কিন্তু চ্যাঁচালে কি হবে? সেই দড়িও সে ছিঁড়তে পারল না, সেই গেরোও সে খুলতে পারল না। ততক্ষণে মাউই এসে তার দিদিমার সেই চোয়াল দিয়ে তাকে মেরে একেবারে থেঁৎলো করে দিল। তার তেজগুলো ধোনা তুলোর মত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে সে অনেক ঠাণ্ডা হয়ে গেল। শেষে বেচারা কোঁকাতে কোঁকাতে বলল 'আর মারিসনে দাদা, ছেড়ে দে!'

মাউই কিন্তু তাকে ছাড়ল না। সে তার দড়ির মাথা সেইখানে পৃথিবীর কিনারার সঙ্গে খুব মজবুত করে বেঁধে রেখে দিল। এখনো

সেই দড়িতে সূর্য্য বাঁধা আছে। মেঘলা দিনে কখনো কখনো সে দড়ি দেখতে পাওয়া যায়। লোকে বলে সে সব সূর্য্যের কিরণ, কিন্তু মাউই জানে আসলে সেগুলো কি! জমদগ্নি মুনিও সূর্য্যকে একবার বেশ জব্দ করেছিলেন। মুনি তীর ছুঁড়ছেন আর তাঁর ব্রাহ্মণী রেণুকা সেই তীর কুড়িয়ে এনে দিচ্ছেন। এর মধ্যে সূর্য্যের তেজে রেণুকা কাহীল হয়ে পড়লেন, আর চলতে পারেন না। তা দেখে মুনি ভয়ানক রাগের ভরে ধনুক তুলে আর একটু হলেই সূর্য্যকে কানা করে দিচ্ছিলেন আর কি! সূর্য্য প্রাণের ভয়ে বিষম ব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি একটি ছাতা আর এক জোড়া জুতো নিয়ে এসে মুনিকে দিয়েছিলেন, তাই রক্ষা। এর আগে আর কেউ ছাতা বা জুতা দেখেনি। মুনি সেগুলি দেখে ভারি আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন। তারপর সূর্য্য যখন তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন যে ছাতা মাথায় দিলে আর জুতো পায় পরলে রোদের ভয় থাকে না, তখন তাঁর সকল রাগ থেমে গিয়ে মুখ হাসিতে ভরে গেল।

হাসির গল্প

উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী

এক বড়লোকের বাড়ীতে ভোজ হচ্ছে, একদল গুলিখোর তাই শুনে সেখানে নিমন্ত্রণ খেতে চল্ল। যেতে যেতে তাদের একজন বল্ল, 'আরে, তোরা যে যাবি, ফটক শুনেছি বড্ড নীচু ঢুকবি কিকরে?'

তা শুনে আরেকজন বল্ল, 'কেন? এমনি করে ঢুকব।' বলেই সে হামাগুড়ি দিয়ে চলতে আরম্ভ করল। তা দেখে আর সব কটাও তেমনি করে হামা দিতে লাগল।

এইভাবে ত তারা গিয়ে সেই ভোজের বাড়ীতে উপস্থিত হয়েছে, আর অমনি যমদূতের মতন চারটে দারোয়ান এসে তাদের ঘাড়ে চেপে ধরেছে!

তখন সেই প্রথম গুলিখোরটা ভারী গম্ভীর হয়ে মোটা গলায় বল্ল, 'এখন দেখ দেখিন? আমি বলেই ছিলাম যে ফটক নীচু, আটকাবে!'

একজন লোক আখরোট গাছের তলায় বসে বলছে 'দেখ ঈশ্বরের কেমন বিচার! আখরোটের ফল এমনি ছোট করেছেন যে তার শাঁসটুকু মুখে দিতে না দিতেই ফুরিয়ে যায়! কেন? এটাকে আরেকটু বড় করলে কি হত?

এমন সময় গাছের উপর থেকে একটি আখরোট টকাস করে তার টাকে পড়েছে। অমনি সে উহুহু! বলে লাফিয়ে উঠে টাকে হাত বুলাতে বুলাতে বল্ল, 'ভাগ্যিস আখরোট এমনি ছোট হয়! বড় হলেত আজ মাথা ফেটেই যেত!'

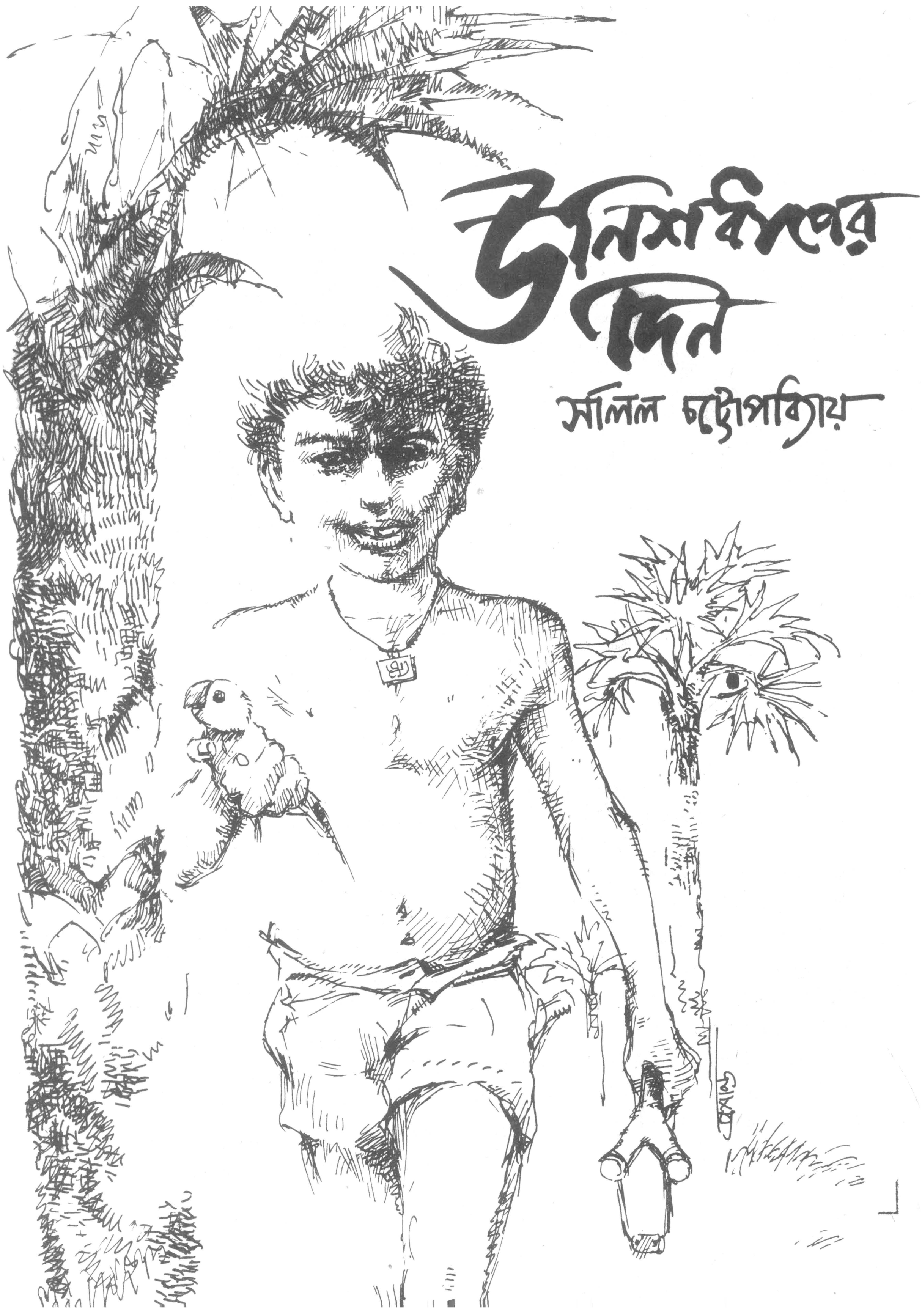
উনিশবিশের দিন
সলিল চট্টোপাধ্যায়

এই মাঠ এখান থেকে রেলরাস্তা অবধি এক সময় হোগলা, কলমী, হিঞ্চে ভরা জলা ছিল। মাঝখানে একটু উঁচু জায়গায় ছিল আমাদের বারোমাস খেলা—কখনো ভাঙা তক্তার ক্রিকেট—কখনো ইঁট সাজানো ফুটবল। মাঠে জল থাকে বর্ষার সুরু থেকে বসন্তের শেষ অবধি। জল সরে গেলে এবড়ো খেবড়ো নীচু মাঠে খেলতে আসবে গ্রীষ্মের ছুটিতে গজিয়ে ওঠা ক্লাব—অন্য পাড়ার ছেলেরা—যারা সুযোগ পেত না আমাদের বারোমাসের খেলার জায়গাটায়।

আমাদের দলটি নেহাৎ ছোট ছিল না; সবাই সেভেন থেকে টেনের ছাত্র। তা হলেও উঁচু মাঠটায় আমাদের হকটা মেনে নেওয়ার কারণ ছিল—আমাদের সকলেরই বাড়ি এ মাঠের কাছাকাছি—আর এ জায়গার জিম্মাদার যে দুজন নেপালি দারোয়ান তাদের সংগে আমাদের ছিল দারুণ ভাব।

এর অনেক পরে,সারা মাঠ জুড়ে বসে গেল দূরসঞ্চারের আকাশ ছোঁয়া খুঁটি—তার মাথায় লাল তারার মত আলো—জাহাজের মাস্তুলের মত সারা খুঁটিগুলোর ঘাটে ঘাটে তার টানা। তারপর চারদিক ঘিরে গেল কাঁটাতারের বেড়া, আমাদের খেলার জায়গায় উঠতে লাগল পাকা সরকারী দালান—লাল-সাদা সাইন বোর্ড চড়ে গেল লোহার খুঁটিতে—হিন্দী বাংলায় ইংরাজীতে লেখা < < দূর সঞ্চার কেন্দ্র > > < < প্রবেশ নিষেধ > > ততদিনে আমরা সবাই পাশটাশ করে কলেজে ভর্তি হয়ে গেছি—ফুলপ্যাণ্ট পরি;পাড়ায় পাজামা—ছোটোরা অন্য মাঠে অন্য ক্লাবে খেলা জমিয়েছে।

বর্ষায় জল থই থই মাঠে হোগলা কলমীর ফুল—টলটল জলের নীচে জানা অজানা জলের গাছ—ওপরে নানা রকম পানা—টোপাপানা পিস্টিয়া। এই জলামাঠের ধারে দেখা যেত ঝাঁক ঝাঁক মাছের চারা—বাচ্চা কাচ্চার দংগল নিয়ে গায়ে শ্যাওলা ধরা বড় বড় শোল মাছ—জলের প্রায়ান্ধকার নীচেটায় তাদের লেজ বা পাখনা নাড়া আবছা দেখা যেত। তখন ছোটদের মত বড়রাও বসে যেত মাছ ধরতে। তবে আমাদের ছিল কঞ্চির ডগায় সুতোয় বাঁধা—এক পয়সার বঁড়শি—ফাতনা লাগতো না, কারণ চোখেই দেখতে পেতাম মাছটা কখন টোপটা গিলছে। টোপ ছিল ভাত না হয় এই জলামাঠের ধার থেকে খুঁড়ে আনা কেঁচো। বড়দের বাহারি ছিপ, পিপঁড়ের ডিম টোপ সঙ্গে টিফিন কেরিয়ারে ভালভাল খাবার। আমরা ধরতাম পুঁটি—কখনো সখনো ছোট ছোট কই। ওরা ধরতো বড় বড় শোল, কি ভটচাজদের পুকুর থেকে ভেসে আসা মৃগেল। তবে আমাদের ছোট ছোট ঘটিগুলো প্রায়ই ফড়ফড়ানো পুঁটিতে ভরে যেত। বড়রা নাক সিটকাত আর দিন শেষে কখনো কালোমুখ, খালিঝুলি, সিগারেট টানতে টানতে ফিরে যেত। পরের রোববার আরও সকাল সকাল এসে বসে পড়ত—কাছাকাছি হলেই চোখে মুখে তাড়া করত—যেন আমরা না থাকলেই সব বড় বড় মাছগুলো আনন্দে আত্মহারা হয়ে ছুটে আসবে ওদের ছিপে।

শীত শেষে সুরু হত সারামাঠ জুড়ে নানা পাখির আনাগোনা। হোগলার পাতা আর শরের ডগায় এসে বসতো ফড়িং—বড়গুলো ঘাসরঙা—ছোটগুলো নীলচে ভেজা ভেজা, ফিঙে বুলবুলিদের ঠোঁটে প্রায়ই দেখতাম ফড়িং ধরা।

এই জলামাঠের উত্তরপুব কোণায় ছিল ভটাচাজদের বাগান—অনেকটা জায়গা নিয়ে; ওর ঘেরা পাঁচিলের বেশিটাই পড়ে গেছে—ভেতরে মস্ত পুকুর—একধারে বাঁধানো ঘাট—যার উনিশ ধাপ পর্যন্ত গুনতে পেরেছিলাম। কেউ কেউ বলত আরও অনেক ধাপ আছে—পুকুরের মাঝ পর্যন্ত চলে গেছে। পুকুরে মাছ ছিল অনেক—ছিল কাঁকড়া, ছোট ছোট কচ্ছপও। তবে ছিপ ফেলার সুবিধা ছিল না—হয় কাঁকড়া নয় অন্য কিছুতে টোপ খেয়ে নিত—তা বঁড়শী বা সুতো যেমনই হোক না। বাগানের চারদিকে তাল নারকেল গাছ—ধুপধাপ তাল পড়ত। নারকেল

আর পুকুরের মাছ পাহারা দিত বিহারী—আমরা বলতাম বিহারীদা। ওর নামটা বোধহয় জন্মস্থানের পরিচয় দিত—বাগানের এক কোণে ধ্বসে পড়া মস্ত পোড়ো বাড়িটার দুখানা ঘরে—ছেলেপুলে গরু ছাগল কুকুর নিয়ে থাকত। বিহারীদার একটা ছেলে—ওর নামটা 'স' 'ফ' ইত্যাদি মিলিয়ে কি একটা উচ্চারণ করত আমরা ধরতে পারিনি—ওকে ডাকা হত 'মাঝু' বলে (বোধহয় 'মেজ' ছিল তাই)—বাগানে গেলে আমাদের দলে সামিল হয়ে যেত।

ভটচাজ্জদের বাগানে শেওড়া আর গাব গাছও ছিল প্রচুর—বাগানের মাঝখানটা—পুকুরের উত্তর দিকে—এই শেওড়া আর গাবগাছে একদম অন্ধকার জঙ্গল হয়েছিল। ওরই ভেতরে আবিষ্কার হল ভাঁট আর বঁইচিতে ঢাকা একটা কবর—সুরকীর মোটা পলেস্তারার ওপর দাগা ছিল কিছু ছ্যাতলা পড়া ইংরেজী অক্ষর—যার শুধু 'এ' 'এন' 'ডি' এবং একটা ভাঙা 'আর' পড়া যাচ্ছিল। তাই নিয়ে কি অসাধারণ রোমাঞ্চ—কেউ বলল এই জলাটায় ছিল পর্তুগীজ জলদস্যুদের আড্ডা—এটা তাদেরই কারো। ওটা যে অ্যানড্রুজ নামেরই কারো হবে তা বড়রাও মেনে নিয়েছিল। আর কিছু জানা গেল না। কবর খুঁজতে গিয়ে এই ঘন গাছপালার ভেতর আবিষ্কার হল এক মস্ত জামরুল গাছ এবং এখানেই একবার মোকাবিলা হল একপাল হনুমানের সঙ্গে—তাড়া করে আমাদের সবাইকে ভাঙা দেউড়ী পার করে দিয়েছিল।

এই বাগানে আমরা যেতাম বড় রাস্তা ধরে অনেক ঘুরে। মাঠ ডিঙিয়ে সাহস পেতাম না—জলামাঠের ভেতরে কাদা থাকত সারা বছর—দলদলে কাদা—হোগলা বনের মধ্যে একবার হাঁটু অবধি কাদায় আটকে গিয়ে ওই পথটা ছেড়েই দিয়েছিলাম। তবে মোষের পিঠে শুয়ে শুয়ে মাঝুর চেয়ে ছোট ছোট ছেলেরা ওই কাদার মধ্যেই ঘুরে বেড়াত আর মোষের গায়ে উঠে আসত ইয়া বড় বড় জোঁক—রক্ত খেয়ে লাল—এক একটা কলার মত ঝুলত। বিহারীদা কিন্তু এই জলা হোগলার মাঠ দিয়েই যাতায়াত করত—একটা ভাল রাস্তা ছিল এরই মধ্য দিয়ে—কিন্তু আমাদের কখনও দেখায়নি; বোধহয় বাগানে আমাদের উপদ্রব বেড়ে যাবে—সেই ভয়ে। তিন মাইল রাস্তা হেঁটে রোজ রোজ খেলতে যাওয়া যায় না—আমরাও কমই যেতাম—রবিবার বা ছুটির দিন ছাড়া সম্ভব হত না। বিহারীদা সকালে চলে আসত আর দুপুরে কখন যে ফিরে যেত ধরতে পারতাম না। আমরা যতদিক দিয়েই যাবার চেষ্টা করেছি—ওই কাদায় গিয়ে আটকে গেছি—জোঁক তো ছিলই—ছোট বড় সাপও ছিল অনেক।

এক ফাল্গুনের শেষে (বোধহয় জন্মদিন হবে) ঠিক হল সবাই যাব, ওই বাগানে চড়ুইভাতি করব। মা রাজি হয়ে গেলেন। ব্যস্ সকালবেলা হাঁড়িকুড়ি হাতা খুন্তি চাল ডাল নিয়ে রিকশা চেপে সদলবলে—কেউ কেউ সাইকেলে ওই বাগানে গিয়ে হাজির—মাঝু আমাদের দেখেই একছুটে চলে এল—মাঝুর মাও গরুকে একদিকে বেঁধে রেখে মার সঙ্গে হাত মিলিয়ে শ্যাওড়া গাছের ছায়ায় উনুন পাততে লেগে গেল। ওদের কুকুরটা কি বুঝল কে জানে—চেঁচামেচি করে সব কাক শালিখ তাড়িয়ে বেড়াতে লাগল—ওর নাম হয়ে গেল 'ভুকু'। মার সঙ্গে এসেছিল মাধবী—মার সবসময়ের সঙ্গী—সে এসেই সব গাছের ফুল তুলতে লেগে গেল—ভাঁট, আকন্দ, কালকাসুন্দিও রেহাই পেল না। মাঝু ও আমার দলের কয়জন আমার বিরক্তি সত্ত্বেও ওর এই ফুলসংহার অভিযানে গিয়ে ভিড়ল। উনুনের ধোঁয়া শ্যাওড়া গাছের অন্ধকার ডালে জমে বকদের উত্যক্ত করে তুলল। বিহারীদার বউ এক সময় কোত্থেকে ক'খানা কলার পাতা কেটে আনলো। মোটা সন্তোষ আর আমি রাশি রাশি শুকনো ডাল জড় করে তুললাম। তারপর 'উনিশ ধাপে'র ঠাণ্ডা জলে সবাই মিলে হৈচৈ করে নেমে গেলাম। স্নান করে উঠে খেয়াল হল—বাড়তি প্যান্ট আনাই হয়নি—

গামছা তোয়ালে সম্বল।

পুকুর ঘাটের একপাশে গোল হয়ে বসে গেলাম—মাঝুও বসল ওর ভাইবোনদের নিয়ে আমাদের সঙ্গে—কাকেরা চারদিকে অধীর আগ্রহে বসে আছে—আমরা একবার উঠলেই হয়! একটা নেউল পেছনের ঝোপ থেকে বেরিয়ে আমাদের দিকে তাকাতে তাকাতে ধীরে সুস্থির চালে ওই হোগলা বনের দিকে চলে গেল—গোল গোল কটা চোখ দুটোতে ভয়ের লেশ ছিল না—কে যেন বলল 'এটা নিশ্চয়ই পোষা'—মাধবী 'ওম্মাগো—এটা যে বাঘের মত দেখতে একদম ভয় পায় না' বলে একটু হুসহাস করল। নেউল একবার ফিরে দেখল মাত্র। খেতে খেতে শুনছিলাম ঘুঘুর ডাক আর কাঠঠোকরার শুকনো ডালে ঠুকরাবার ঠর্‌র্‌ ঠর্‌র্‌র্‌ শব্দ। পড়ন্ত আলোয় পুকুরের ওপারের নারকেল গাছের ছায়া জল পার হয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। হঠাৎই মাথায় এল—এখান থেকে হোগলা বনের মধ্য দিয়ে যাবার পথটা খুঁজে বার করলে হয় না? তাহলে আর রিকশা খুঁজতে যেতে হবে না। মাঝুকে বলতেই ও অবাক করে দিল। বলল—'আমি তো চিনি।' ওকে জিজ্ঞাসা করাটা আমাদের কখনো মনেই হয়নি।

বেলা থাকতে বেরিয়ে পড়লাম—থালা বাসনের ঝুলি মোটা সন্তোষের ঘাড়ে চাপিয়ে (আমাদের রবিনহুড খেলায় ও হত 'ফ্রায়ার টাক্‌')—কারো হাতে উনুন, কারো বগলদাবা সতরঞ্চি—বাড়তি খাবারদাবার, বিহারীদার জন্য মাঝুর মাকে দিয়ে, হোগলা বনের মধ্য দিয়ে সার বেঁধে চললাম। মাথা সমান উঁচু হোগলা—পথ চলেছে একেবেঁকে; খানিকটা যাবার পর মোড় ঘুরতেই এক বিশাল ঝিল—চারধারে হোগলা নলখাগড়া শরবনের মাঝে যে এতবড় একটা ঝিল থাকতে পারে—ভাবতেও পারিনি। ঝিলের ওপর চারদিকে কচুরিপানার মাঝখানে অনেকখানি পরিষ্কার টলটলে জল—তাতে বালিহাঁসের একটা ছোট ঝাঁক সাঁতার কাটছে—দু-তিনটে কানঠুঁটি (ফ্ল্যামিংগো) একধারে হাঁটি পা পা-হাঁটি-পা-পা চরে বেড়াচ্ছে—। এধারে একপাশে কাত হয়ে পড়ে আছে একটা মস্ত লম্বা ছুঁচোলো নৌকার খানিকটা—কত পুরানো কে জানে, তার সারা গায়ে মোটা মোটা রঙের ছাতা শুকনো শক্ত হয়ে আছে। এখানে এরকম নৌকা এল কোত্থেকে! কাছের নদী গঙ্গা এখান থেকে তিন-চার মাইল মাঝখানে বিশাল শহর—এপাশে রেল লাইন—তার ওপারেও জলা—তারপর বিরাটি, ওধারে দমদম ক্যাণ্টনমেণ্ট। নদী ছাড়া এতবড় নৌকা এখানে এল কি করে! কতরকমের পাখি এই ঝিলে—ক্ষুদে বাটা, (গোল্ডেন প্লোভার) ঝিলের ধার দিয়ে দৌড়োচ্ছে—আমাদের দেখে যেন ওদের ছুটোছুটি আরও বেড়ে গেল। বাড়ির ছাত থেকে যে দেখতাম শামুকখোল, হাড়গিলে, দোচরা, সব হোগলা বনের মধ্যে নেমে যাচ্ছে—সে সবই তাহলে এ ঝিলের জলেই থাকত। ঝিলের পশ্চিম দিকটায়—যেদিকে আমাদের বাড়ি—জল কম কিন্তু থকথক করছে কাদা—এধারটা উঁচু সেই পাড় ধরে এগোচ্ছি একটু যেতেই একটা লম্বা ঘাট—ভাঙা, ইঁট বের করা; পুকুর ঘাটের মত নয়, মাত্র তিনধাপ সিঁড়ি, অনেকটা চওড়া, পাতলা সরু সরু ইঁটে গাঁথা। ঘাট পেরুতেই একটা ডাহুকীর পিছে পিছে তিনটে ছানা জলা ছেড়ে বাঁদিকে হোগলা বনে ঢুকে গেল।

সবার আগে মাঝু, পেছনে আমরা, মার সামনে মাধবী আর সবার পেছনে মোটা সন্তোষ বাসনের বস্তা ঘাড়ে। রাস্তাটা উঁচু হয়ে হঠাৎই মোড় ঘুরে উঠে এল সেই পোড়ো ঘর দুটোর পেছনে যেখানে বাহাদুররা থাকে, যে জায়গাটায় আমরা সারা বছর খেলি। 'পেয়ে গেছি' বলে আমরা কয়েকজন একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলাম। অর্থাৎ এ পাড়া থেকে ওই বাগানে যাবার যে রাস্তাটা এতকাল খুঁজেছি সেটা আজ পেয়ে গেলাম। শুধু তাই নয় আরো পেলাম এক রহস্যময় ঝিল যার অস্তিত্বই কেউ জানতাম না, এমন কি বাহাদুররাও নাকি

জানতো না।

হোগলা নলখাগড়ায় লুকানো ওই ঝিলের খবর এ পাড়ার কেউই জানত না। আমরাও কাউকে বলিনি। তাহলে মাছধরা বাবুরা,যাদেরকে আমরা দুচক্ষে দেখতে পারতাম না, তারা নিশ্চয় গিয়ে ভিড় করত। ওই নৌকোর রহস্য উদ্ধার করতে আমরা অনেকবারই ওখানে গেছি। নতুনদের সঙ্গে নিতাম না। নৌকোর ভাঙা অংশটা মাটিতে এমনভাবে বসে গিয়েছিল, একটু নাড়াতেও পারিনি। ইতিহাসপ্রেমিক অনি বলেছিল বড় হয়ে ও এখানটায় 'এক্সক্যাভেশান' চালাবে 'এই ঘাট স্নানের ঘাট নয় নৌকো বাঁধার ঘাট' 'এক সময় নিশ্চয় গঙ্গার সঙ্গে যোগ ছিল।' 'হতে পারে ওই উনিশ ধাপের পোড়ো বাগান সত্যি কোন জলদস্যুদের আস্তানা ছিল আর এই ধরনের লম্বা ছুঁচোলো নৌকায় চড়ে ওরা ডাকাতি করে ছুটে পালিয়ে যেত' এমনিসব জল্পনায় ওই ঝিলের ধারে ধারে ঘুরে বেড়াতাম।

কিছুদিন পরে—বাটাংরা চলে গেছে, কান-ঠুঁটিরাও ছিল না। ওদের অনেকেই ছিল পরিযায়ী। নিশ্চয়ই ওই বাদাবনে ডিম ফুটিয়ে বাচ্চা বড় করে দেশে ফিরে গেল; কিন্তু বেলা শেষের অল্প আঁধারে দেখলাম বেশ নকশাদার সাদা বরফি-কাটা জোড়া টিকিআলা বাচ্কাদের ঝাঁক। এরা দিনের বেলায় আমাদের বাড়ির সামনে মিলিটারী ক্যাম্পে (তাতে কোন মিলিটারী থাকতো না) বড় বড় বটগাছগুলোয় বসে থাকত আর কর্কশ ডাকে মাঝে মাঝে চমকে দিত। বাচ্কাদের ঝাঁক দেখতে গিয়ে নজরে পড়ল। একদম থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম—আট ন' ফুট লম্বা দুটো সাপ প্রায় পাশাপাশি ভাঙা নৌকার পাশ দিয়ে সরসর করে জলে নেমে গেল, তারপর জলের ওপর মাথা নাড়তে নাড়তে চলে গেল ওই পশ্চিম দিকটায়। রোগা সন্দীপ 'সাপ' বলে চীৎকার করে উঠল, পটন বোধহয় সঙ্গে সঙ্গেই উল্টো দিকে ছুট দিল। আধো আলোয় সাপ দুটোকে মনে হল মিশকালো। আমাদের তর্ক বেঁধে গেল ওগুলো কি সাপ। দেবু সদ্য গ্রাম থেকে এসেছে সে বলল ওগুলো জলঢোড়া, সন্দীপ নিঃসন্দেহ এগুলো অজগর, সন্তোষ বিদ্রূপ করে বলল 'সব সর্পবিশারদ'। 'সাপ চিনিস? ওদুটো করাতি গোখরো।' রামবাহাদুরের ঘরের সামনে পেঁাছোতেই বাহাদুর সরবে বকতে সুরু করল—সন্ধ্যাবেলা এই বাদায় আমরা কি করছি। গত সন্ধ্যায় ও এখানটায় একটা মস্ত বড় খারাপ সাপ দেখেছে। ও সাপে কাটলে আর মা বলার টাইম পাব না।

তারপর বোধহয় অনেকদিন আর যাওয়া হয় নি। বাহাদুররা বাড়িতে নালিশ করে থাকবে। তবে পরীক্ষার পড়া, অসুস্থতা, হাওয়া বদল এসবে বেশ কমাস কেটে গেল। ফিরে এসে এক বিকালে স্কুল ফেরত একা একাই এসে দাঁড়ালাম রামবাহাদুরের ঘরের সামনে। তখন প্রথম বর্ষা; সারা বাদাজুড়ে সবুজের চেকনাই—মাঠের এধারে জল জমতে সুরু করেছে। নতুন জল থেকে অসংখ্য ব্যাঙের বাচ্চা উঠে এসে যেখানে সেখানে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে এবং প্রায়ই পায়ের নীচে চ্যাপটা হয়ে যাচ্ছে। বাহাদুরের ঘরের পেছনে ঝিলের রাস্তা ধরে মাথায় গামছা বাঁধা বিহারীদা উঠে আসছে। চীৎকার করে জিজ্ঞাসা করি 'বিহারীদা কেমন আছ? মাঝু কোথায়? কেমন আছে? তোমার ছাগলটা বাচ্চা দিয়েছে?' বিহারী আবছা হাসল। মাথা নেড়ে শেষবেলার সূর্যের দিকে আঙুল দেখিয়ে জানাল মাঝু চলে গেছে;মাঝু আর নেই। ধাক্কা লাগল বুকে। আমার খুব অনুগত ছিল। উনিশ ধাপের বাগানে যখন কলম্বাস খেলতাম ও আমার ক্যাবিন বয় হত। আমার ছেলেবেলার রেল-গাড়িটা ওকে দিয়েছিলাম, ও আমাকে একজোড়া ছাতার পাখি ধরে দিয়েছিল ছাতুগোলা খাইয়েও বাঁচাতে পারিনি। বাগানে নারকেল গাছের ডগায় গর্ত করে চন্দনা পাখিরা বাসা করেছিল, ও বলেছিল ওখান থেকে বাচ্চা ধরে এনে আমায় দেবে। সেই মাঝু নেই!' কি হয়েছিল?—'বুখার'

তিনদিন জ্বরে ভুগে চলে গেছে। ওর নাম নাকি ছিল আশরফিলাল। বিহারী শুধু বলল 'ভগমানের দেনা ভগমান শুধে নিয়েছেন।'

সেই উঁচু মাঠটার একপাশে পড়ে আছে বাণ্ডিল বাণ্ডিল তারকাঁটা, বড় বড় কাঠের বাক্স। চুপচাপ খানিকক্ষণ বসে রইলাম। কেবলই মনে হচ্ছিল ঝিলের ধারে চন্দনার বাচ্চা হাতে মাঝু আসছে—বাঁহাতে গুলতি, দড়িবাঁধা হাফপ্যাণ্টটার নিচে ছিঁড়ে ঝুলে আছে—খালি গা গলায় হনুমানজীর পদক, হাসিভরা মুখ। মা বলত ভদ্রলোকের ছেলেদের মত চেহারাটা অর্থাৎ সুন্দর।

এরপর দূরসঞ্চার কেন্দ্রের বোর্ড লেগে গেল। সারা বাদাজুড়ে পোঁতা হতে লাগল বিশাল বিশাল খুঁটি। রাতদিন ট্রাকে ট্রাকে আসতে লাগল জিনিষপত্র আর ধুলোয় আমাদের বাড়ি-ঘর ঝাপসা দিনে দশবার ঝাঁট দেয়া হতে থাকল। বাদা মাঠের রহস্যে ভরা ঝিল আমাদের নাগালের বাইরে চলে গেল।

ওই বাগানে তারপরেও গেছি। সেই ভেঙে-পড়া পোড়ো বাড়িতে বিহারী আর নেই। যেখানটায় রান্না হত দেয়ালে কালির তিলক লম্বা হয়ে আছে—উনুনটা ভাঙা—দেউড়ির বাইরে কি একটা মেসার্স এণ্টারপ্রাইজের বোর্ড লেগেছে—একটা ফ্যাকটরী হচ্ছে। নোতুন লোকেরা জানাল উনিশ ধাপের পুকুরটাও বুজিয়ে ফেলা হবে।

নূতন ধাঁধা

অহিভূষণ চৌধুরী

১

দুইভাগে পঞ্চবর্ণ, করো অন্বেষণ
পুণ্যবান্ বলে মানি লভিলে দর্শন!
দু'ভাগের আদিবর্ণ নারীরূপ ধরে
শেষদ্বয় বর্ণে পাবে নারীর ঈশ্বরে!
দ্বিতীয় তৃতীয় বর্ণে নির্জীব আধার
লোক মাঝে উপহাস্য ধারক তাহার!

২

সমাজের ঘৃণ্য আমি তিনাক্ষরে নাম
প্রথম বিহনে মোর বৃক্ষ'পরে ধাম!
দ্বিতীয় বিহনে চলি পণ্যযানে ধীরে—
তৃতীয় বিহনে ধন্য হেরি জননীরে!

উত্তর! ১। রাধামাধব
২। মাতাল

গ্রে ফ্রায়ারস ববি

অরুণকুমার দত্ত

বিংশ শতাব্দীর ষাট দশকের গোড়ার কথা লিখছি। আমি তখন এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্র। স্কটল্যাণ্ডের রাজধানী এডিনবরা শহরের তিনদিকে পাহাড়; আর একদিকে সমুদ্র। এডিনবরা শহরের কেন্দ্রস্থলও একটি পাহাড়ের টিলার ওপর অবস্থিত। সেই পাথুরে টিলার ওপরকার এডিনবরো কাসল দেখতে সারা পৃথিবী থেকে বহু পর্যটক আসেন। টিলাটার ঠিক নিচে কোনো সময় কোনো এক নদী বয়ে যেত। এখন সেই নদী দিক পরিবর্তন করেছে; কিন্তু সেই খাদ এখনও রয়ে গেছে। সেই খাদের ওপর দিয়ে এখন রেললাইন চলে গেছে। এডিনবরা শহরের ওয়েভারলি ও ক্যালিডোনিয়ন এই দুই স্টেশন কাসল-এর সামনের প্রধান রাজপথ প্রিন্সেস স্ট্রীটের দুই প্রান্তে অবস্থিত। কাসল-এর টিলার ঠিক নিচে চোখ ধাঁধানো বর্ণবৈচিত্রে ভরা মরসুমি ফুলের বাগান প্রিন্সেস গার্ডেন অবস্থিত। এই প্রিন্সেস স্ট্রীট গার্ডেনে বিখ্যাত স্কচ্ মনুমেন্ট আছে। কাসল-এর একপাশে রেললাইনের ওপর দিয়ে শহরের অন্যপ্রান্ত থেকে একটা সরু সেতু প্রিন্সেস স্ট্রীটের ঠিক মাঝখানে এসে পড়েছে।

এত কথা লেখার কারণ আছে। এই সেতুটা থেকেই এই কাহিনীর উৎপত্তি। আমি একদিন গরমকালের ঝলমলে রোদ ওঠা দুপুরে একলা সেতুটার ওপর দিয়ে উঠে প্রিন্সেস স্ট্রীট গার্ডেনে ঘুরতে যাচ্ছিলাম। গরমকালের ঝলমলে দুপুর কথাটা শুনলে অনেকের হয়ত একটু আশ্চর্য লাগবে। এডিনবরা শহরে বছরের বেশিরভাগ সময়েই ঝিরঝিরে বৃষ্টি আর ধোঁয়াশা ভরা আকাশ থাকে। শীতকালে আকাশের সূর্যকে পূর্ণিমার চাঁদের থেকেও নিষ্প্রভ মনে হত। তাই বৃষ্টিবিহীন রোদ ওঠা গ্রীষ্মে আমাদের মন খুশিতে ভরে যেত।

সেতুটায় উঠে কিছুটা এগোনর পর লক্ষ্য করলাম একজন মাঝবয়সী স্কটিশ ভদ্রলোক আমাকে অনুসরণ করছেন। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, —'আপনি কি আমাকে কিছু বলতে বা জিজ্ঞেস করতে চান? আমার সঙ্গে সঙ্গে আসছেন দেখছি।' আমার কথা শুনে ভদ্রলোক একটু থতমত খেয়ে গেলেন। আমতা আমতা করে তিনি বললেন, 'না, দেখলাম আপনি একা একা ঘুরছেন। এডিনবরা এখন পর্যটকে ভরে গেছে। তাই আমাদের চারদিকে লক্ষ্য রাখতে হয়।'

আমি বুঝতে পারলাম ভদ্রলোক পুলিশের গুপ্তচর বিভাগের লোক। আমাকে একা রাস্তায় দেখে, সন্দেহ করে অনুসরণ করছিলেন। কথায় কথায় আমি বিদেশী ছাত্র, নতুন এসে এডিনবরা শহরে ঘুরতে বেরিয়েছি শুনে তিনি ঈষৎ হেসে বললেন, 'আপনাকে সন্দেহ করার জন্যে মাপ করবেন। আপনি কিন্তু আপনার খুব কাছের একটা বিখ্যাত জিনিস না দেখেই চলে যাচ্ছেন। অথচ এই দ্রষ্টব্য বস্তু দেখতে ও তার ফটো তুলতে পর্যটকরা এডিনবরায় ছুটে আসেন।

আমার বিস্মিত মুখের দিকে তাকিয়ে ভদ্রলোক আকর্ণ বিস্তৃত হাসি হেসে বললেন, 'এই সেতুতার রেলিং-এর শুরুতে যে কুকুরের মূর্তি বসানো রয়েছে, সেটাকে কি লক্ষ্য করেছেন?'

ভদ্রলোকের দৃষ্টি অনুসরণ করে সিমেন্টের সাদা রেলিং-এর মুখের কাছে, একটা কালো কুকুরের মূর্তি দেখে আমি বিস্মিত ও পুলকিত হলাম। কালো পাথরে খোদাই করা একটা ছোট কুকুরের বসা অবস্থায় সুন্দর মূর্তি। সূক্ষ্ম কারুকার্যে কুকুরটার ঢেউ খেলানো কালো লোমগুলো পর্যন্ত সুন্দরভাবে রূপায়িত করা হয়েছে।

আমাকে নীরব দেখে ভদ্রলোক বললেন, 'এই কুকুরটাকে "গ্রে ফ্রায়ারস ববি" বলা হয়। এর পেছনে একটা ইতিহাস আছে।'

এরপর ভদ্রলোক সেই অজানা ইতিহাস জানাতে, আমাকে সেতুটার নিচের অপ্রশস্ত আঁকাবাঁকা রাস্তা দিয়ে আর একটা পল্লীতে নিয়ে এলেন। এডিনবরা শহরের ছবির মতো আঁকা অন্যান্য অঞ্চলগুলোর তুলনায় এ জায়গাটা অনেক কদর্য, অনেক নোংরা। ঠিক যেন প্রদীপের নিচের অন্ধকার।

স্কটিশ ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'আপনি এডিনবরায় নতুন এসেছেন; ঘুরে দেখতে চান বলে আমি নিজের কাজ ফেলে এ জায়গায় আপনাকে নিয়ে এলাম। এ অঞ্চলটার নাম গ্রে ফ্রায়ার।' এরপর তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে একটা সমাধি ক্ষেত্রের ভেতরে ঢুকলেন। দুটো সমাধি বেদীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে তিনি তর্জনী তুলে বললেন, 'ঐ ছোট সমাধিটা হচ্ছে ঐ কুকুরটার, আর এপাশের সমাধি হচ্ছে তার প্রভুর।' এরপরে ভদ্রলোক সেই কুকুরটার যে কাহিনী আমাকে বলেছিলেন সেকথাই এখানে লিপিবদ্ধ করছি।

কুকুরটার প্রভু যুদ্ধোত্তর পর্বে এডিনবরার এই অঞ্চলটার একটা বাড়িতে নিঃসঙ্গভাবে থাকতেন। তার একমাত্র সঙ্গী ছিল এই কুকুরটা। অবশ্য বৃটেনে বহু বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা এভাবে একক জীবন-যাপন করেন। কুকুরটা ছিল ভদ্রলোকের নয়নের মণি। বৃদ্ধ ভদ্রলোক যেখানেই যেতেন, কুকুরটাকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। কোনো সময়েই কুকুরটা তাঁর কাছছাড়া হত না। কুকুরটা প্রায় মানুষের মতনই হয়ে গিয়েছিল। ভদ্রলোকের নিঃসঙ্গ জীবনের সেই ছিল একমাত্র সঙ্গী। ভদ্রলোকের সুখ-দুঃখ মানুষের মত কুকুরটা ভাগ করে নিত।

একদিন খুব সকালে, এডিনবরা শহরের এক চলমান পথিক অবাক হয়ে দেখল, একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে তাঁর কাছে ছুটে আসছে, তাঁর ট্রাউজার দাঁত দিয়ে ধরে টানছে। আবার পরক্ষণেই ট্রাউজার ছেড়ে দিয়ে, আর একদিকে ছুটে যাচ্ছে।

কুকুরটার এই অস্বাভাবিক ব্যবহারে পথিক ভদ্রলোক বিস্মিত হলেও বিরক্ত হলেন না। বুদ্ধিমান পথিক বুঝলেন, কুকুরটা তাকে কিছু ইঙ্গিত করছে। এখানে বলা দরকার, বৃটেনে নেড়িকুত্তা বা রাস্তার কুকুর বলে কিছু নেই। সেখানে সব কুকুরেরই মালিক আছে। কুকুরদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। প্রতিষেধক টীকাও দেওয়া হয়।

আমাদের দেশ হলে, রাস্তার কুকুর ভেবে, চলমান পথিক হয়ত কুকুরটাকে তাড়িয়ে দিতেন; কিন্তু সেই ভদ্রলোক কুকুরটার পেছন পেছন চলতে লাগলেন। অবশেষে একটা উঁচু বাড়ির একেবারে ওপরের ফ্ল্যাটে এসে ঢুকলেন। খোলা দরজা দিয়ে তিনি কুকুরটার প্রভুর ঘরে এলেন। তারপর অবাক হয়ে দেখলেন, গৃহস্বামী মারা গেছেন। এ ধরনের নিঃশব্দ মৃত্যু বৃটেনে অনেক নিঃসঙ্গ মানুষেরই হয়ে থাকে। কারণ সমাজ সেবিকারা ছাড়া তাদের কাছে বড় একটা কেউ যায় না।

সেই পথিক ভদ্রলোক তখনই আশেপাশের প্রতিবেশীদের প্রকৃত ঘটনাটা জানিয়ে দিলেন। তারপর যথারীতি শব সমাহিত করার ব্যবস্থা হল। শব বাহকদের সঙ্গে সঙ্গে সেই কালো কুকুরটাও শবানুগমন করল। কফিনের ওপর মাটি চাপা দিয়ে সবাই চলে গেলেও, কুকুরটা কিন্তু সেই সমাধির ওপরে চুপচাপ বসে রইল। সারাদিন কিছুই খেল না, জলস্পর্শ পর্যন্ত করল না। লোকেরা তার সামনে দুধ, খাবার রেখে অনেক ইঙ্গিত করল। কুকুরটা কিন্তু কিছুই মুখে দিল না। শুধু তার দুচোখ বেয়ে একনাগাড়ে জল ঝরতে লাগল।

পরদিন সকালে সেই সমাধি ক্ষেত্রে লোকেরা এসে দেখল, মৃত প্রভুর সমাধির ওপরে কুকুরটার মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। বিশ্বস্ত, প্রভুভক্ত কুকুর, তার আজীবনের সঙ্গীকে ছেড়ে বাঁচতে চায়নি। শহরের লোকেরা সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সমাধির পাশে কুকুরটাকে সমাহিত করলেন।'

স্কটিশ ভদ্রলোক এবার থামলেন। আমি মুখ খুলে বললাম, 'বুঝতে পেরেছি! তাই আপনারা কুকুরটার মূর্তি তৈরি করে ঐ সেতুর মুখে বসিয়েছেন।' একটু থেমে বললাম, 'এই জায়গাটার নাম "গ্রে ফ্রায়ার" জানতে পারলাম; কিন্তু ঐ কুকুরটার নাম গ্রে ফ্রায়ারস ববি হল কেন?' আমার অজ্ঞতা দেখে এবার ভদ্রলোক হো হো করে হেসে বললেন, 'আমরা চলতি ভাষায় পুলিশকে ববি বলি। ঐ কুকুরটা, এই গ্রে ফ্রায়ার অঞ্চলের পুলিশ। যে গ্রে ফ্রায়ারকে পাহারা দিচ্ছে। মানুষ বিশ্বাসঘাতক হয়; কিন্তু প্রভুভক্ত কুকুররা কখনও নেমকহারামি করে না। তারা যার নুন খেয়েছে তার জন্যে জান দেয়।'

সত্যি সত্যি

করুণাময় বসু

বলতো গোপী, চিনিস নাকি গঙ্গাপ্রসাদ পাল কে?
থাকতো আগে পাইক পাড়া, এখন থাকে শালখে।
সেই পেয়েছে পারিতোষিক, দাদাসাহেব ফালকে।
এই খবরটা বলতে শুনি ব্রিজভূষণ লালকে,
সত্যি সত্যি স্বপ্নে নাকি সে দেখেছে কালকে।

দুলিয়া ও বুনো হাতি

তপন কুমার চৌধুরী

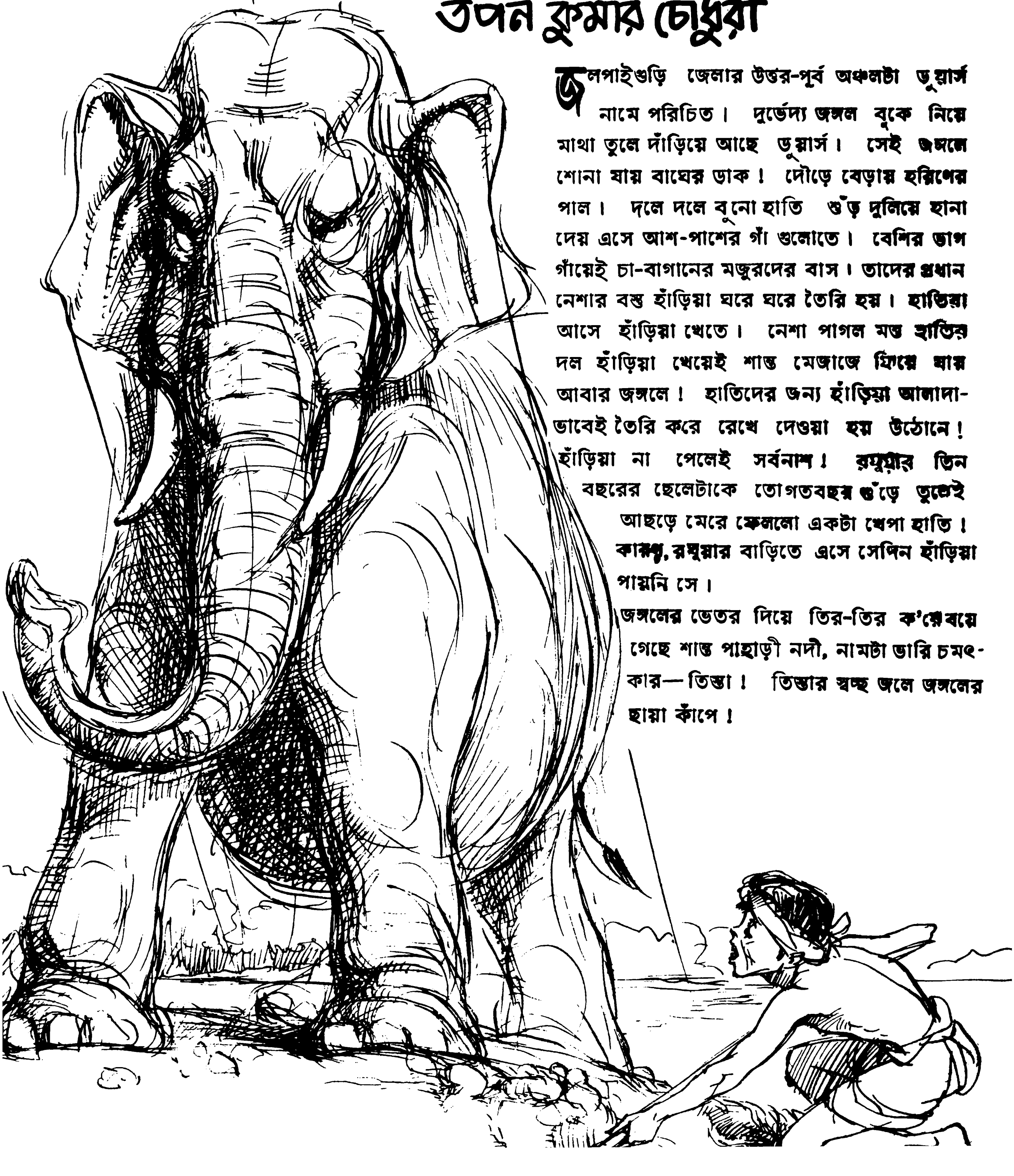

জলপাইগুড়ি জেলার উত্তর-পূর্ব অঞ্চলটা ডুয়ার্স নামে পরিচিত। দুর্ভেদ্য জঙ্গল বুকে নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে ডুয়ার্স। সেই জঙ্গলে শোনা যায় বাঘের ডাক! দৌড়ে বেড়ায় হরিণের পাল। দলে দলে বুনো হাতি শুঁড় দুলিয়ে হানা দেয় এসে আশ-পাশের গাঁ গুলোতে। বেশির ভাগ গাঁয়েই চা-বাগানের মজুরদের বাস। তাদের প্রধান নেশার বস্তু হাঁড়িয়া ঘরে ঘরে তৈরি হয়। হাতিরা আসে হাঁড়িয়া খেতে। নেশা পাগল মত্ত হাতির দল হাঁড়িয়া খেয়েই শান্ত মেজাজে ফিরে যায় আবার জঙ্গলে! হাতিদের জন্য হাঁড়িয়া আলাদা-ভাবেই তৈরি করে রেখে দেওয়া হয় উঠোনে! হাঁড়িয়া না পেলেই সর্বনাশ! রঘুয়ার তিন বছরের ছেলেটাকে তোগতবছর শুঁড়ে তুলেই আছড়ে মেরে ফেললো একটা খেপা হাতি! কারণ, রঘুয়ার বাড়িতে এসে সেদিন হাঁড়িয়া পায়নি সে।

জঙ্গলের ভেতর দিয়ে তির-তির ক'রে বয়ে গেছে শান্ত পাহাড়ী নদী, নামটা ভারি চমৎকার— তিস্তা! তিস্তার স্বচ্ছ জলে জঙ্গলের ছায়া কাঁপে!

হরিণেরা এসে জল খেতে খেতে চকিতে পেছন ফিরে চায়, বাঘের হুঙ্কারে নিমেষে হারিয়ে যায় জঙ্গলের গভীরে ! এই তিস্তা নদীটাই পেরচ্ছিল হাতির দল ! একটা দলে দু-তিনটে বাচ্চা হাতি নিয়ে প্রায় দশ-বারোটা জোয়ান হাতি থাকে। শীতের তিস্তা। জল তেমন বেশি নেই। স্রোতের ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝেই জেগে উঠেছে বালির চড়া। বেশ জমিদারী চালেই চলছিল হাতিগুলো। হঠাৎ একটা জোয়ান হাতির পেছনের একটা পা ডেবে গেল চোরা বালিতে। চললো অনেক কসরৎ, কিন্তু না, পা আর ওঠে না ! বরং যেন আরোও ডেবে যায় ! হাতিটা বার কয়েক বিকট চিৎকার করলো, সঙ্গীরা ততক্ষণে নদী পেরিয়ে চলে গেছে ওপারে। কেউ ফিরেও তাকালো না, ভাবখানা, আগে তো হাঁড়িয়া খেয়ে আসি, পরে দেখা যাবে ! নদীর মাঝামাঝি জায়গায় বন্দী হয়ে রইলো হাতিটা। এখন আর একদম নড়ছে না সে ! ভাগ্যের ওপর সবকিছু ছেড়ে দিয়েই মাঝে মাঝে শুঁড়টাকে নমস্কারের ভঙ্গীতে কপালে ঠেকাতে লাগল !

তখনও সন্ধ্যা হতে ঘণ্টা তিনেক বাকি। কোদাল কাঁধে বাড়ির দিকে ফিরছিল সাঁওতাল ছেলে দুলিয়া। মাটি কাটার কাজ করে ও। ভীষণ পরিশ্রমী আর সাহসী ছেলে। হঠাৎ ব্যাপারটা গোচরে এল ওর। হাতিটা ওকে দেখেই ঘাড় ফিরিয়ে বড় বড় কান দুটো নাড়ল বার-কয়েক। তারপর বালিতে গেঁথে যাওয়া পা টা নাড়াতে চেষ্টা ক'রে ব্যাপারটা বোঝাতে চেষ্টা করল দুলিয়াকে।

দুলিয়া এ'কবারেই বুঝে গেল। তারপর ঠাট্টার সুরে বলল, কেমন মজা। বোঝ্ এবার বন্দী থাকবার মজাটা। বলেই দুলিয়া সামনের দিকে হাঁটতে শুরু করল। দুলিয়াকে চলে যেতে দেখেই হাতিটা করুণ সুরে বারকয়েক চিৎকার করল। যেন বলল 'যেও না দুলিয়া, তুমি আমাকে বাঁচাও !' দুলিয়া ফিরল। এগিয়ে এল হাতিটার কাছে। কেমন যেন মায়া হল। ঘাড় থেকে কোদালটা নামিয়ে ঝুঁকে পড়ে দেখতে থাকল, প্রায় হাঁটু অব্দি ডেবে গেছে হাতির পা-টা। এই চোরা বালি থেকে হাতিকে মুক্ত করা কি সোজা কথা ! তবুও চেষ্টা করতে দোষ কি ! কোদালটা দিয়ে 'হেঁইও-হেঁইও' ব'লে সমানে হাতির গেঁথে যাওয়া পা টার চারপাশের বালি সরাতে থাকে দুলিয়া। কাজটা ভয়ানক পরিশ্রমের কিনা, কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে ও। কপাল জুড়ে ঘাম চিকচিকিয়ে ওঠে! একটু জিরিয়ে নিয়েই আবার লেগে যায় বালি সরাতে। ঠিক যেন গর্তে পোঁতা মস্ত একটা কাঠের খুঁটি তুলছে দুলিয়া। হাতিটাও মাঝে মাঝে পা-টা তোলার চেষ্টা করছে ; কিন্তু বৃথা, নট্-নড়ন-চড়ন। দুলিয়া বালি সরাচ্ছে তো সরাচ্ছেই। ওরও যেন জেদ চেপে গেছে, হাতিটাকে যে করেই হোক বাঁচাতে হবে।

শেষে একসময় পরিশ্রমের ফল পেল দুলিয়া, হাতির পা-টা যেই না আল্‌গা হয়েছে, অমনি পেছন ফিরে দৌড়ে পালাতে গেল দুলিয়া। হাজার হোক, বুনো হাতি বলে কথা ! কিন্তু পালাতে আর পারল কোথায় ! পা-টা চোরা-বালি থেকে মুক্ত হতেই নিমেষের মধ্যে ঘুরে শুঁড় বাড়িয়ে পালাতে যাওয়া দুলিয়াকে তুলে নিল বুনো হাতিটা ! ব্যস, দুলিয়াও প্রাণের মায়া ছেড়ে মনে মনে ভগবানকে ডাকতে থাকল ! এখনি হয়তো সজোরে আছড়ে ফেলবে, আর সাথে সাথেই অক্কা পাবে দুলিয়া ! ঈশ, কেন যে গায়ে পড়ে বিপদটা ডেকে আনতে গেল !

দুলিয়াকে শুঁড়ে পেঁচিয়ে হাতিটা এগিয়ে চলল নদীর ধার ঘেঁসে। জঙ্গলের মাঝে বসে থাকা মানুষখেকো বাঘের জিব লক্‌লক্ করতে থাকল। হাতির শুঁড় থেকে একবার পড়ে গেলেই হয় ! কিন্তু না, দুলিয়াকে হাতিটা ফেলে দিল না ! ওকে নিয়ে চলল এগিয়ে ! এনে হাজির করল একদম দুলিয়ার বাড়ির উঠোনে। আস্তে করে শুঁড় থেকে নামিয়ে দিল দুলিয়াকে ! তারপর দু'পা পিছনে গিয়ে শুঁড়টাকে কপালে তুলে চিৎকার

করে কি যেন বলে ঘুরে দাঁড়িয়ে থপ্ থপ্ করে চলে গেল হাতিটা।

দুলিয়া তো ভীষণ অবাক! ওর বউ দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা দেখতে দেখতে ভিরমি যাবার মতো অবস্থা হল। আর দুলিয়ার ছোট ছেলেটিতো বাবাকে হাতির শুঁড়ে করে বাড়ি ফিরতে দেখে ধেই ধেই করে নাচ জুড়ে দিল আনন্দে। হাতিটা যে কি করে দুলিয়ার বাড়ি চিনল সেটা একটা অবাক কাণ্ডই বটে। তাছাড়া এই ঘটনার পর থেকে আর কোন বুনো হাতি হাঁড়িয়া খাবার জন্য দুলিয়ার বাড়িতে আসেনি! কে জানে ঐ হাতিটাই হয়তো সভা করে সব হাতিকে জানিয়ে দিয়েছে, দুলিয়া আমাদের বন্ধু। ওকে বিরক্ত করা চলবে না!

হ্যাটট্রিক

আশিস কুমার মুখোপাধ্যায়

ফুটবলে হ্যাট্‌ট্রিক্
করেছিল কাবলে,
ওর সম্মান দেখে
ভূতনাথ ভাবলে—
হ্যাট্‌ট্রিক্ করবই।
তাই শেখে খেলা সে,
ভুলে গিয়ে দু বছর
আছে এক কেলাসে।
হ্যাট্‌ট্রিক্ করা চাই
মনে এই বাসনার
সার্থক রূপ দিতে
ভূতনাথ শাসন আর—
না মেনেই কারুর-ই
খেলাতেই মত্ত।
তোলা থাকে তাকে আর
খাতা বই পত্তর।
জেনে রেখো ভূতুর এই
গল্পটা পুরোনো
স্কুল জীবনের সেই
স্মৃতি থেকে কুড়োনো।
অবশেষে একদিন
এলো ওরও দখলে
দুর্লভ হ্যাটট্রিক,
তাও জানো সকলে।
তবে ফুটবলে নয়
হোলো ওর হ্যাট্‌ট্রিক
পর পর তিন বার
ফেল মেরে ম্যাট্রিক।

বনের খবর

প্রমদারঞ্জন রায়

জোঁক যদি দেখতে চাও ত কাছাড়ের বনে একটিবার যাও। অনেক জায়গায় ঘুরেছি, এমন জোঁক আর কোথাও দেখিনি। সে জোঁকই বা কত রকমের! ছোট, বড়, মাঝারি। এক একটা ২ ইঞ্চি ২॥ ইঞ্চি লম্বাও আছে। সে যখন রক্ত খেয়ে পটলের মত মোটা হয়, তখন তাকে দেখলে প্রাণ উড়ে যায়। কত রঙেরই বা জোঁক। মেটে, কটা, কালো, ফ্যাকাসে, সব্‌জে, ছেয়ে। এক একটার আবার গায় ডোরা ডোরা—জলের ভিতর দেখলে হঠাৎ মনে হয় যেন প্রকাণ্ড শুঁয়ো পোকার মতন। দুচার ফোঁটা জল পড়লে আর জোঁকের জ্বালায় ঘাসের উপর দিয়ে বা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে চলবার যো নাই। আধ মাইল যেতে না যেতেই দুটি পা একেবারে জোঁকে বোঝাই হয়ে যায়। ১৫/২০টা করে একসঙ্গে এসে ধরে। যাদের খালি পা, তাদের ত অনেক সময়ই দা দিয়ে চেঁছে তবে জোঁক ছাড়াতে হয়। এতেও যদি অব্যাহতি পাওয়া যেত তবে দুঃখ ছিল না। অনেক জায়গায় নীচে ত জোঁক রয়েছেই, তার উপর আবার গাছ থেকেও টুপটাপ মাথায় পড়ে।

সার্ভেয়ার খালাসী পাঠিয়েছে, ডাকের জন্য। চিঠিপত্রও আনবে, তার সঙ্গে চালডালও কিছু আনবে। এর মধ্যে বৃষ্টি হয়ে গেছে। ফিরবার সময় খালাসিটি একটা জলার উপর দিয়ে পোল বেয়ে আসছ—২ খানা করে আড়া-আড়ি বাঁশ, তার উপর লম্বালম্বি তিন খানা পাতা, তাই হল 'পোল', তারি উপর দিয়ে আসছে। এমন সময় সে নীচের দিকে চেয়ে দেখে—মাছ! কই মাছ আর ল্যাটা মাছ—বৃষ্টির জল জমেছে ইঞ্চি তিনেক, তাতে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। সে মাছের লোভ কি আর সামলানো যায়? খালাসিভায়া ও তখনি লাফিয়ে গিয়ে মাছ ধরতে নামল। আর সে যায় কোথায়! বেচারা আর উঠবার পথ পায় না, এমনি

জোঁক তাকে ধরেছে! অনেক কষ্টে উপরে উঠে, পা দুখানির দিকে চেয়েই তার চোখ একেবারে কপালে উঠল। সে পা দুটো যেন তার জোঁক দিয়েই তৈরী হয়েছে—এত জোঁক! ভাগ্যিস আর একজন লোক সঙ্গে ছিল, সে দা দিয়ে অনেক কষ্টে জোঁক ছাড়াল, নইলে সেদিন মাছ খাওয়া ভাল করেই হয়েছিল আর কি!

আমার ত ভাই বাঘভালুককে তত ভয় করে না, এই জোঁককে যত ভয় করে! ভয় করবে না? কত ফন্দিই করি যাতে এর হাত এড়াতে পারি, কিন্তু এড়াবার যো কি! কখন ধরে তাও বুঝবার উপায় নাই; বুঝবার আগেই সে যত খুশী রক্ত খেয়ে পেট ঢাক করে থাকবে। মোজা, তার উপর বুট, তার উপরে পাজামা, তার উপর হাঁটু অবধি পট্টি জড়ান—তবুও তাকে ফাঁকি দিবার যো নাই—এতগুলো জিনিসের ভিতরেও সে অনায়াসে বেমালুম ঢুকে যাবে। এমন জানোয়ারকে ভয় করব না ত কাকে করব?

ত্রিপুরার মহারাজের রাজ্যে ভারী ভারী সব বন আছে। কোন কালে এ সব জায়গায় মানুষের বাস ছিল। বনের ভিতর বড় বড় পুকুর পাওয়া যায়; উত্তর দক্ষিণে লম্বা, দেখলে মনে হয় হিন্দুর পুকুর। কোন কোন জায়গায় এখনও নহর (ক্ষেতে জল নিবার খাল) রয়েছে, কিন্তু তাতে জল নাই, আর সে সব ক্ষেতও অবশ্য এখন নাই। এখন খালি ২০/২২ ফুট শরবন, আর নল, আর বেত, আর জঙ্গল। কতকাল যাবৎ যে এ-সব গ্রাম লোপ পেয়েছে, তার ঠিক নাই; ওদেশের লোকেরাও বোধ হয় ভাল করে বলতে পারেন না। আজকাল আবার একটু একটু আবাদ আরম্ভ হয়েছে। ২/৪/৬ ঘর লোক এক এক জায়গায় গ্রামের পত্তন করছে।

এদের বড় কষ্ট। বর্ষায় জ্বরে মরে, তারপর হাতী, শূয়রে ধান খেয়ে যায়। দিনের বেলায় তারা ধান কাটে, আর রাত্রে জেগে সেই ধান পাহারা দেয়, নইলে হরিণে আর শূয়রে তার আর কিছু রাখে না। এদের একজন মুসলমান আমাকে অনেক আদর করে বল্ল, 'হুজুর, দু একটা শূয়র মারতে পারলে বড় উপকার হয়। তার কথায় আমি শূয়র মারবার জন্য অনেক রাত্র পর্যন্ত বন্দুক হাতে নিয়ে বসে রইলাম, কিন্তু সেদিন আর শূয়র এলই না, লাভের মধ্যে আমি সেখানকার বিষম হিমে একেবারে ভিজে গেলাম। তখন আমি বিরক্ত হয়ে তাঁবুতে এসে সবে একটু ঘুমিয়েছি, অমনি একজন লোক 'হুজুর, হুজুর' বলে ছুটে এসে বল্ল, '৪০/৫০টা এসে নেমেছে! আসুন!' কিন্তু তখন আর কে যায়!

আরেক দিন সেখানকার কয়েকজন ভদ্রলোক মিলে আমাকে শীকারে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। হাতীতে করে ৫/৬ মাইল যেতে হবে। সঙ্গে লোকজন বিস্তর চলেছে, তাদের ঘাড়ে এই বড় বড় জাল। সেই জাল দিয়ে বনের এদিকটা ঘেরা হবে। দুটো দুটো জালের মাঝখানে ১৫/২০ ফুট করে ফাঁক থাকবে, সেই ফাঁকে ফাঁকে একেকজন শিকারী দাঁড়াবে বন্দুক নিয়ে। বনের এক পাশে খোলা মাঠ, আরেক পাশে নদী। এ মাথায় ত জালই রয়েছে; এর প্রায় ১॥ মাইল দূরে ওমাথায় গিয়ে সঙ্গের লোকেরা সার বেঁধে সোরগোল করে, ঢোল পিটে, কেরোসিনের টিন বাজিয়ে, জঙ্গল ভেঙ্গে আসতে থাকবে। বনের ভিতরে জানোয়ার যারা আছে, তারা তখন বেগতিক বুঝে এই সকল জালের ফাঁক দিয়ে পালাবার জন্য ছুটে আসবে। সেই সময় বন্দুক দিয়ে তাদের মারতে হবে।

আমরা ৫ জন বন্দুকওয়ালা, আর একজন বুড়ো শিকারী, বল্লম হাতে। এ লোকটি খুব নামজাদা শিকারী, অনেক বাঘ শিকারের পাণ্ডা। কে কোথায় দাঁড়াবে সেই সব ঠিক করে দিল। আমরা দাঁড়িয়েছি, লোকজন সব আমাদের আশপাশে দুচারজনকে গাছে তুলে দিয়ে অন্য দিকে চলে গিয়েছে। এদের উপর কড়া হুকুম,

কোনদিক দিয়ে জানোয়ার পালায় তার খেয়াল রাখবে। বুড়ো শিকারী বলতে লাগল যে, 'বড় শিয়াল—বাঘ—বেরোবার খুবই সম্ভাবনা। এই জঙ্গলটুকু বাঘের আড্ডা বল্লেই হয়। শুনেই শিকারীরা গাছে উঠবার পথ দেখতে লাগলেন। দুজন উঠে পড়লেন, আর দুজন তার সুবিধা না পেয়ে, একটা খোলা জায়গায় গিয়ে একসঙ্গে দাঁড়ালেন।

আমি মাটিতেই বসে আছি; মোটা মানুষ; গাছে ওঠা আসে না। খানিক পরে বুড়ো আস্তে আস্তে এসে আমাকে মাটিতে দেখে কি যেন ভাবল, তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'কর্ত্তা বুঝি গাছে উঠবেন না?' আমি বল্লাম, 'না', তা শুনে সে বল্ল, 'তবে আমি কর্ত্তার কাছেই দাঁড়াব।' যেখানে বসেছিলাম, বুড়োর সে জায়গাটা পছন্দ হল না; সে আমাকে নিয়ে একটা বাঁশ ঝোপের পিছনে দাঁড় করিয়ে দিল। বুড়ো বল্ল, 'যদি হরিণ আসে, সামনে থাকতেই মারবেন; কিন্তু যদি 'বড় শিয়াল' বেরোয়, তাহলে আমাদের ছাড়িয়ে চলে গেলে তবে মারবেন,—পাঁজরার দিকে।'

দুজনে বসে আছি। ঢোলের আর টিনের একটু একটু আওয়াজ কানে আসছে, বনের ভিতরে জানোয়ার নড়ার শব্দও শোনা যাচ্ছে। শুনেই ত আমি একেবারে বন্দুক তুলে তৈয়ার! —রাম! রাম! আমি কি জানি শেষে একটা শেয়াল এসে বেরুবে? আমার যে রাগ হলো! এতক্ষণে লোকজনের চীৎকারও একটু একটু শোনা যাচ্ছে। তখন আবার বনের ভিতর জানোয়ার নড়ার শব্দ—শুকনো পাতার উপর পায়ের আওয়াজ—এবারে সেই যে দুটি ভদ্রলোক এক জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়েছেন, তাঁদের সামনে। কিন্তু একটু আওয়াজ হয়েই তখনই আবার চুপচাপ হয়ে গেল।

বুড়ো আমাকে হুঁসিয়ার করে দিল, 'জানোয়ার যাই হোক ওদিক থেকে আমাদের দিকে আসছে।' এতক্ষণে লোকের গোলমাল বেশ কাছেই। ঐ। আবার জানোয়ারের! গড়্‌ড়্! গড়্‌ড়্! একবার আওয়াজ হতেই আমি বন্দুকের দুই ঘোড়া তুলে তয়ের। পরক্ষণেই হুড়মুড় করে সব ভেঙ্গে পাঁচটা হাতী এসে বেরুল—পোষা হাতী!

আমরা প্রাণপণে হাউমাউ করে, বাঁশ নিয়ে ঠেঙ্গিয়ে হাতীগুলোকে ফিরাতে কত চেষ্টা করলাম, কিন্তু তারা কি তা শোনে? একে হাতী, তাতে পোষা! হাঁউমাউ তারা ঢের শুনেছে, ঠেঙ্গাকে তারা হিসাবই করে না। জালটাল সব ছিঁড়ে তারা বাইরে গেল। ওদেশে হাতীগুলোকে বনে ছেড়ে দেয়, তাদের ইচ্ছামত চরে খায়। দিনে, কখনো বা দুদিন পর একবার এসে মাহুতেরা তাদের দেখে যায়।

সেদিন যে আর আমাদের শীকার জুটল না, একথা আমি বলবার আগেই নিশ্চয় তোমরা বুঝে নিয়েছ!

গ্রাম থেকে দেড়দিন দু-দিনের পথ দূরে ঘোর জঙ্গলে দু-জন সার্ভেয়ার কাজ করছে; তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে ৯/১০ জন করে লোক। কুলী বেচারীরা বনে থাকে, নুন লঙ্কা আর ভাত ছাড়া অন্য খাবার তাদের প্রায়ই জোটে না, তাও আবার দুদিনের পথ থেকে ১৫ দিনের মতন এনে রাখতে হয়। মাঝে মাঝে নুন অধিক ফুরিয়ে যায়, তখন শুধু ভাত খায়।

আজ বড় ভারী শিকার জুটেছে। কাজ শেষ করে সার্ভেয়ার তাঁবুতে ফিরে আসছে, আর চোখের সামনেই শীকার—প্রকাণ্ড হরিণ, তাকে মারতেও হবে না, এর আগেই বাঘে তাকে মেরে নিয়ে খেতে বসেছে। মেরেছে যে অনেক আগে তাও বোধ হচ্ছে না,—জোর ঘণ্টা দেড়েক হবে।

সকলে মিলে প্রাণপণে চ্যাঁচামেচি করে বাঘটাকে ত তাড়ান হল, তারপর তারা আনন্দে নাচতে নাচতে হরিণটাকে নিয়ে চল্ল। বাঘ তার

অতি অল্পই খেয়েছিল, সে দিকের খানিকটা তারা কেটে ফেলে দিল। কিন্তু এত বড় হরিণ কি সহজে বয়ে নেওয়া যায়? তার উপর আবার অনেকখানি পাহাড় উঠতে হবে, এদিকে সারাদিন খেটে সকলে কাহীল হয়ে পড়েছে।

তখন তারা বুদ্ধি করে, উপস্থিত কাজ চালাবার মতন শুধু একটা ঠ্যাং কেটে নিয়ে, বাকি হরিণটা একটা গাছের উপর, দুটো ডালের মাঝখানে মাটি থেকে ১০/১২ হাত উঁচুতে টাঙিয়ে রেখে গেল।

সে রাত্রে আহারটি হয়েছিল বেশ ভাল রকমই। পরদিন সকালেও সে মাংসে কাজ চলেছিল। তারপর দিন কাজে যাবার সময় সার্ভেয়ার বল্ল, 'দুদিনের চালডাল বেঁধে নিয়ে চল, কাজ করতে করতে অনেক দূর যেতে হবে, ফিরবার সুবিধা হবে না।' খালাসিদের খুবই ফূর্তি, তারা শুধু চাল আর নূন-লঙ্কা সঙ্গে নিয়েছে—মাংস ত রাস্তায়ই টাঙ্গান রয়েছে, তাই দিয়ে বেশ জমাট রকমের ভোজন হবে।

জিনিসপত্র বয়ে নিয়েই হাসতে হাসতে সেই গাছতলায় এল, কিন্তু হায়! হায়! একি সর্বনাশ;—মাংস যে নাই,—একটুও নাই! আছে খালি গাছের গায় বাঘের নখের আঁচড়। বাঘের মত জন্তু, সে নিজের ধরা শীকারটা এত সহজে ছেড়ে দিবে, তাও কি হয়ে থাকে? সে চুপিচুপি তাদের সঙ্গে এসে সবই দেখে গিয়েছিল; তারপর, সুবিধা বুঝে লাফিয়ে লাফিয়ে থাবা মেরে গাছ থেকে হরিণটিকে নামিয়ে নিয়েছে! মাটিতে যে রক্ত পড়েছিল, তা অবধি চেটে চেটে খেয়ে যেতে ভোলে নি!

আহা! বেচারাদের যে কষ্ট, সেই কষ্ট! আবার নূন লঙ্কা দিয়েই ভাত খেতে হল।

বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ,
ভাদ্র, আশ্বিন —১৩২১

অনেকে সন্দেশের 'বনের খবর' লেখাগুলি গল্প মনে করে পড়েন। এ সব যে সত্য ঘটনারই বর্ণনা তা অনেকেই জানেন না। যিনি বনের খবর পাঠান তাঁকে বাস্তবিকই ওই রকম বনে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে কাজ করতে হয়। শশী, গঙ্গারাম এ সবই সত্যিকার লোকের নাম। 'বনের খবর' ঘরে বসে কল্পনা করে লেখা গল্প নয়—সত্যি সত্যিই বনের খবর।

টোটোর অ্যাডভেঞ্চার

নদীর ধারে রাত্রিবেলা
ভাই সব পরশুদিন এই বাঁধ উদ্বোধন হবে। কোয়াচ্চার আত্মার আদেশে আমরা সৈন্য সামন্ত নিয়ে বাঁধ ধ্বংস করব তোমরাও আমাদের সাহায্য কর এই নাও বন্দুক আমরা আবার পুরনো দিনে ফিরে যাব
কি বুঝছ?
হুম্ এ্যত গুলো লোকে এদিকে তিনটে বন্দুক দিল চল খবর দিয়ে আসি
দাঁড়াও যারা বন্দুক পেল তাদের মুখ গুলো দেখে রাখি
বেশি সময় নেই কেল সবাই মিলে ঠিক করতে হবে যুদ্ধের সময় কে কোথায় থাকব
প্রোফেসর এই দুজনকে টোটো চারিদিকে নজর রাখার দায়িত্ব দিয়ে-ছিল। ওরা বলছে পরশুদিন উরুক্তি আক্রমন করছে!!
ওরা কোন দিক দিয়ে আসবে?
এদিক দিয়ে
কি করা যায়?!
এদিকে বেশ বড় বড় পাথর আছে রাস্তাটাও সরু দেখি কি করা যায়
আমার কিন্তু খুব বেশি সৈন্য সামন্ত নেই

মহারাজ আপনি ঘরের শত্রুদের গ্রেপ্তারের বন্দোবস্ত করুন
টোটোর লোক দুজন রাস্তায় যেতে যেতে একটা লোককে দেখতে পেল
ঐ দেখ পালের গোদা বান্টু!!
বান্টুকে যদি কয়েকদিন আটকে করে রাখি তাহলে বাকি বিদ্রোহীরা আর কিছু করতে পারবে না
কিভাবে রাজপ্রাসাদ আক্রমন করব এখুনি সেটা ঠিক করতে হবে।
ঠকাস!!
অন্যদিকে
কাল যুদ্ধ অথচ বান্টু এখনও এল না
বান্টু আর আসবে না হাত তোল তোমাদের গ্রেপ্তার করা হ'ল!!
হাসপাতালে
ওঃ তোমার জ্ঞান ফিরেছে!!
ওঃ কি তেষ্টা নার্স একটু জল দেবেন
খানিক পরে হাসপাতালে
এই হ'ল অবস্থা কি করি বলতো?
দাঁড়ান! ঐ দিন বাঁধি উদ্বেগিন হবেন না একটা ফন্দি এসেছে

উৎসাহের চোটে গাধাটা না নিজের ঠ্যাঙটা কাটে
হৈঃ হাঃ হৈঃ
ঐ যে ওরা আসছে সব তৈরী তো?
ওরা বিনা বাধায় শুকনো নদীতে নাবল
হাঃ হোঃ
হাঃ হাঃ হোঃ হাঃ
বাঁধ উদ্বোধন করুন
সব লক গেট উঠে গেল
হুহুহুস
বাঁচাও!!
Fire!!

শিম্পু ডিটোনেটরে চাপ দিল
ধড়াম্
পাথর পড়ে সরু পাহাড়ী রাস্তা বন্ধ হয়েগেল
কোন দিকে যাব?!
দুদিক তো বন্ধ!!
উরুক্তির যোদ্ধারা তোমরা অস্ত্র ফেলে যদি শান্তিপূর্ন ভাবে নিজেদের দেশে চলে যাও তাহলে আমরা কিছু বলবনা! যদি তা না কর তোমাদের ওপরে পাহাড় ফাটানো অস্ত্র নিয়ে লোক আছে তারা তোমাদের শেষ করবে!!
সবাই অস্ত্র ফেল্!!
সাম্বাটু আর ওরোগোকে রেখে তোমরা চলে যাও আর এদিকে এসো না!!
রাজধানীতে
বারুস্তার রাজা প্রধানমন্ত্রীকে আপনাদের সাহায্যের কথা জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন আপনারা বারুস্তাকে যে ভাবে সাহায্য করেছেন তাতে দেশের মুখ উজ্জ্বল হয়েছে প্রধানমন্ত্রী আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে আগ্রহী। কিন্তু আপনাদের শিম্পু কোথায়?
অনেকদিন বাদে দেশে ফিরেছি আমি কোথাও যাচ্ছি না বাবা
শেষ

জানোয়ারের বন্ধুতা

উপেন্দ্রকিশোর রায়

পথ যেতে যেতে অনেকবার দেখেছি যে বাঁদরনাচওয়ালা যখন তার বাঁদর আর ছাগল নিয়ে রাস্তা দিয়ে যায়, তখন যত রাজ্যের কুকুর সেই বাঁদরগুলোর পিছনে লাগে। বাঁদর আর কুকুরের মধ্যে যে খুব বেশী ভাব নেই, সেটা তখন বেশ বোঝা যায়। কুকুর কিনা সর্বদা মানুষ দেখে, সে বেশ মানুষ চেনে। সে হয়ত বাঁদর দেখলে মনে করে—"এ লোকটা ত মানুষ নয়, অথচ এর কেন মানুষের মত চাল চলন? গম্ভীর হ'য়ে ছাগলের উপর ব'সে আছে, মাথা চুলকাচ্ছে আবার চারিদিকে তাকিয়ে চোখ মিটমিট করছে! বাস্তবিক, এ রকম চাল দেখলে ত রাগ হবারই কথা।

কিন্তু এই ছবিখানা একবার দেখ ত! ষণ্ডা-মার্কা হোঁৎকামুখো 'বুলডগ' আর ছোট, বাঁদর ছানাটি দুজনে কেমন গলাগলি ভাব। ছোট্ট খোকাটির মত বুলডগের কাঁধে মাথা রেখে বাঁদর ছানা কেমন সুন্দর আরামে ঘুম দিচ্ছে। সে বেশ জানে, শুধু যে বুলডগ তাকে কিছু বলবে না তা নয়, পাড়ার দুষ্টু কুকুরগুলোও এ সময়ে তাকে কিছু বলতে সাহস পাবে না কারণ বুলডগ ত ঘুমোয় নি। সে আদ্‌খানা চোখ মেলে মিটির মিটির ক'রে তাকিয়ে দেখছে। যেন বলছে, "খবরদার, আমি কিন্তু জেগে আছি, ওকে তোমরা বিরক্ত ক'রো না।"

অনেক বছর আগে আলিপুরের চিড়িয়াখানায় একটা বনমানুষ ছিল। তাকে বাঁদর ব'ললে সে হয় ত রাগ করবে কারণ সে ত সামান্য বাঁদর নয়,—সে 'ওরাংওটান'—'বনের মানুষ'। তার চাল চলন, মেজাজ, সব প্রায় মানুষের মত। সে একদিন কোথা থেকে একটা বেড়ালছানা ধ'রে এনে তাকে আদর ক'রে খাবার দিয়ে ভুলিয়ে ভালিয়ে তার সঙ্গে ভাব ক'রে নিল। আমরা যেমন ক'রে বেড়াল কি কুকুর পুষি সেও ঠিক তেমনি ক'রে তার পোষা ছানাটিকে যত্ন করত আর কাছে কাছে রাখত। মাঝে মাঝে যে গাছের উপরে ছেড়ে দিত না, বা লেজ ধরে টানত না তা নয়, কিন্তু এ সব আবদার উপদ্রব সহ্য করেও বেড়ালছানাটা তার কাছে থাকতেই ভাল বাসত। শেষটায় যখন ওরাংওটানটাকে বিলেতের চিড়িয়াখানায় পাঠান দরকার হ'ল, তখন সে কিছুতেই তার পোষা বেড়ালকে ফেলে যেতে রাজি হ'ল না—বেড়ালকে বগলে নিয়েই সে জাহাজে গিয়ে চড়ল, বেড়ালশুদ্ধ বিলেতের চিড়িয়াখানায় গিয়ে হাজির হ'ল।

আর একটা বেড়ালছানা একটা প্রকাণ্ড কুকুরের সঙ্গে ত ভাব ক'রেছিল। কুকুরটা ইচ্ছা করলে তাকে এক গ্রাসে খেয়ে ফেলতে পারত, কিন্তু তা হলে কি হবে? বেড়াল ছানা তার উপরে এমনি সর্দ্দারি করত, যে লোকে দেখে অবাক হ'য়ে যেত। কুকুর বেচারা হয়ত ঘুমোতে চায়, বেড়ালের অমনি ইচ্ছা হ'ল সে একটু খেলা করে। তখন যদি কুকুর একটু চোখ বোজে, বেড়ালছানা তার গায়ে চ'ড়ে ধমক দিয়ে নাকে মুখে আঁচড় কেটে তার ঘুম ভাঙাবেই! কুকুর বেচারা ভালমানুষটির মত সব সহ্য ক'রত!

এই আর একটা ছবি দেখ। এই দুজনের মধ্যে কেন যে এত ভাব তা বলা শক্ত। সুন্দর শাদা শান্তশিষ্ট বেড়ালটি, নিতান্তই ভাল মানুষ, আর কুকুরটা দুষ্টু দুরন্ত যতদূর হ'তে হয়! তা ওর চেহারা দেখলেই বেশ বোঝা যায়। কোথাও কিছু দেখলেই ওর একবার তাতে উঁকি মারা চাই, কোন নূতন জিনিষ পেলেই তাতে

একবার নাক ঠেকান চাই। অথচ ওরই মধ্যেই খেলতে খেলতে কতবার দৌড়ে এসে বেড়ালের খোঁজ নিয়ে যায়। ফোঁস ফোঁস ঘোঁৎ ঘোঁৎ ক'রে বেড়ালের গায়ের উপরে আশে পাশে ঘুরে বেড়ায়। বেড়াল তাতে কোন দিনও আপত্তি করে না।

সাধারণত দেখা যায় পাখী দেখলেই বেড়ালের খাবার লোভ জেগে ওঠে। খাঁচার মধ্যে পাখী থাকলে বেড়াল কি রকম হতাশভাবে তার আশেপাশে ছটফট ক'রে বেড়ায় কখন দেখেছ কি? তখন এক একবার তার চোখটা স্থির হ'য়ে আসে, লেজটা থেকে থেকে সটান সোজা হ'য়ে ওঠে, কেবল তার আগাটুকু আস্তে আস্তে নড়তে থাকে. তার মনের মনের মধ্যে তখন যে কি রকম হয়, তা ওর পায়ের দিকে তাকালেই বেশ বুঝতে পারবে। দেখবে তার নখগুলো এক একবার হিংস্র উৎসাহে বেরিয়ে আসছে, আবার বেচারা হতাশ হ'য়ে নখ লুকিয়ে ফেলছে। কিন্তু আমরা একবার একটা বিড়াল দেখেছিলাম, তার সঙ্গে একটা পোষা টিয়া পাখীর বড্ড ভাব ছিল। সে টিয়াপাখীর দাঁড়ের কাছে এসে চুপ ক'রে বসে থাকত, রোজ দুপুরে সেই খানেই ঘুমাত। সে যে কেবল বন্ধু তার খাতিরেই আসে, তার মনে যে কোন রকম দুষ্ট মতলব নেই, তা বেশ পরিষ্কার বোঝা যেত। টিয়া পাখিও তাকে কিছুই বলত না, অথচ অন্য কোন বেড়াল কাছ দিয়ে গেলেই চেঁচিয়ে বাড়ী মাথায় করে তুলত। এ রকম আরো কত দেখা গিয়েছে, —হাঁসের ছানা বা মুরগীর ছানা বেড়ালের মুখের সামনে বেড়াচ্ছে, গায়ে চড়ছে, অথচ বেড়াল তাদের কিছুই বলছে না। বরং সে তাতে বেশ খুসী হ'চ্চে ব'লেই বোধ হয়।

অনেক সময়ে দেখা যায় কোন জানোয়ারের ছানা মারা গেলে অন্য জন্তুর ছানার উপর তার কেমন একটা মায়া জন্মে যায়। একটা জন্তু একেবারে অন্য রকমের আরেকটা জন্তুর ছানাকে নিজের ছানার মত যত্ন ক'রে রাখছে,·এ রকম অনেক সময়েই হতে দেখা যায়। এখানটায় যে ছবিটা দেখছো ঐটার মধ্যে একটা ত কুকুর

বুঝতেই পাচ্ছ—আরেকটা কি? আর একটা হ'চ্ছে সিংহের ছানা! কুকুরটা এক চিড়িয়াখানার কর্মচারীর কুকুর—তার নিজের ছানা মারা যাওয়াতে সে একদিন রাত্রে চুপিচুপি এই ছানাটাকে চুরি ক'রে এনেছে! প্রথমটা চিড়িয়াখানার লোকেরা তাতে খুবই আপত্তি ক'রেছিল—কিন্তু যখন দেখা গেল কুকুর তাকে সর্বদা নিজের কাছে রেখে দুধ খাওয়াচ্ছে, যত্ন করছে, বেশ সুখেই রেখেছে, তখন আর কেউ তাতে আপত্তি করল না। কুকুর এখন সিংহের বাচ্চাকে নিজের ছানার মত আদরে রেখে মানুষ করছে—না, মানুষ করছে কেমন করে? সিংহ ক রে তুলছে।

শুক পাখী

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

টিয়া, কাকাতুয়া, চন্দনা, নুরী, ফুলটুসী মদনা, এরা সকলেই শুক পাখী। অতি প্রাচীন কাল থেকে লোকে এই পাখীকে পুষে আসছে, আর তার কত আদর কর্‌ছে তার সীমাই নাই। সংস্কৃতে এই পাখীর অনেক নাম আছে। খুব বুদ্ধিমান, তাই তার নাম 'মেধাবী'; ঠোঁটটী বাঁকা তাই সে 'বক্রচঞ্চু' বা 'বক্রতুণ্ড'; ঠোঁট লাল তাই 'রক্ততুণ্ড'; দেখ্‌তে ভালো তাই 'প্রিয় দর্শন'; সুন্দর কথা কয়, তাই 'মঞ্জুপাঠক'; 'কী' এমনি শব্দ করে তাই 'কীর'; কথা সঞ্চয় করে অর্থাৎ স্মরণ করে রাখে, তাই 'চিমি'।

ঠোঁট লাল বলে শুকের নাম 'রক্ততুণ্ড'। এ থেকে এই মনে হচ্ছে যে, যে গুলোকে আমরা টিয়া আর চন্দনা বলি, সেইগুলোই আসলে আমাদের দেশের শুক, আর গুলোর অনেকেই বিদেশ থেকে আসে। এগুলো গরম দেশের পাখী, পৃথিবীর সকল গরম স্থানেই এদের দেখা যায়। আসিয়ায় আছে, আমেরিকায় আছে, আফ্রিকায় আছে, অস্ট্রেলিয়ায় আছে।

অস্ট্রেলিয়ায় প্রথমে যখন সাহেবেরা গিয়েছিলেন তখন এই সকল পাখীর জ্বালায় তাঁদের বাস করাই দায় হয়ে উঠেছিল। পঙ্গপালের মত আকাশ অন্ধকার করে তারা শস্যের ক্ষেতে এসে পড়্‌ত, আর শস্যের শীষ কেটে মুখে করে নিয়ে গাছে বসে মনের আনন্দে খেত। এখন ক্ষেতের সংখ্যা বেশী হয়েছে, এ সব পাখীও দেশময় ছড়িয়ে পড়েছে, তাই এখন আর এক একটা ক্ষেতের উপরে তত বেশী টিয়া দেখা যায় না। আগে যখন ক্ষেতের সংখ্যা অল্প ছিল, তখন এক এক ক্ষেতে ত্রিশ চল্লিশ হাজার করে টিয়া এসে পড়্‌ত।

টিয়ার ঠোঁট দেখেছ, কি চমৎকার। টিয়া তার ঠোঁট দিয়ে যেমন সহজে আর পরিষ্কার করে শস্যের খোসা ছাড়িয়ে শাঁসটুকু খায়, আর কোন পাখী তেমন পারে না। জিবখানি ঠিক যেন মানুষের জিবের মত। অনেকে বলেন যে এইজন্যই টিয়া এমন পরিষ্কার কথা বল্‌তে পারে।

আমার একটি টিয়া ছিল, সে এমন সুন্দর কথা কইত যে, তেমন সুন্দর কথা আর আমি কোন পাখীকে বল্‌তে দেখিনি। কেউ তার সাম্‌নে আছাড় খেলে সে "হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ" করে হাস্‌ত। কুকুর দেখ্‌লে তাকে 'আ তু!' বলে ডাক্‌ত। যে সব লম্বা কথা সে আওড়াত তার মধ্যে দুটি হচ্ছে এই—

"কৃষ্ণ কথা! কৃষ্ণ কথা!
কৃষ্ণ কথা কওরে প্রাণ,
কৃষ্ণ ভজিলে পরিত্রাণ"
"চক্রধর কৃষ্ণ জগত করতা
ত্বরিতে তরাও কৃষ্ণ তুমি সে ভরসা।"

এই পাখীটি আমাকে বড্ড ভালবাসত। আমি তার দাঁড়ের আছে মুখ নিলেই অমনি সে খুব মিষ্টি সরু সুরে "উঁ—!" বলে, তার ঠোঁটটি এনে আমার নাকে ঠেকিয়ে রাখ্‌ত।

এ হচ্ছে টিয়ার চুমো খাওয়া। অনেক টিয়াই এমনি করে থাকে। একবার এই কথা নিয়ে ভারি মজা হয়েছিল।

এক সাহেবের টিয়া চুরী যায়, আর তাই নিয়ে কাছারীতে মোকদ্দমা হয়। টিয়া পুলিসের লোকে কাছারীতে এনে হাজির করেছে, এখন সেটি যে সেই সাহেবের, একথা প্রমাণ কর্‌তে হবে। সাহেব খাঁচার কাছে মুখ নিয়ে গেলেন, অমনি পাখীটি তাড়াতাড়ি এসে আদরের সহিত তাঁকে চুমো খেল। তাতে একটা ছোকরা বল্ল যে, যে খাঁচার কাছে মুখ নেবে তাকেই পাখী চুমো খাবে। একথা প্রমাণ করে দেবার জন্য সে খাঁচার কাছে গিয়ে বল্ল, "আমাকে একটা

চুমো খা ত।" অমনি মাথা ফুলিয়ে চোক রাঙ্গিয়ে তার ঠোঁট এমনি কাম্‌ড়ে ধর্‌ল যে ঠোঁটশুদ্ধ ছিঁড়ে নেবার গতিক! সে ছোকরা যতই ভ্যা ভ্যা করে চ্যাঁচায়, টিয়া ততই আরো বেশী করে ঠোঁট বসিয়ে দেয়! অনেক কষ্টে শেষে তাকে ছাড়ান হয়েছিল।

তার পর গোলমাল থেমে গেলে সেই সাহেব টিয়াটাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কুকুর কি বলে?" টিয়া বল্ল, "ভৌ, ভৌ, ভৌ!" "বিড়াল কি বলে?—"মিউ মিউ মিউ!"

এক দোকানীর একটা টিয়া দুটি কাজ জান্‌ত। সে শিষ দিতে পার্‌ত, আর বল্‌তে পার্‌ত "ভাগ, বেটা!" এক দিন পাখীটা খাঁচায় বসে শিষ দিচ্ছিল, তাই শুনে একটা কুকুর ভাব্‌ল বুঝি তার মুনিব ডাক্‌ছে। এই ভেবে বেচারা যেই ছুটে খাঁচার কাছে এসেছে, অমনি পাখীটা চেঁচিয়ে বলে উঠ্‌ল, "ভাগ্‌, বেটা!" তা শুনে কুকুর থতমত খেয়ে তখনি লেজ গুটিয়ে পৃষ্ঠভঙ্গ দিল।

আর একটা টিয়া স্পেন দেশে একটা বাড়ীতে থাক্‌ত সেইখানে সে কয়েকটা স্পেন দেশী কথা শিখেছিল। তারপর একজন ইংরাজ কাপ্তেনের কাছে তাকে বেচে ফেলা হয়। কাপ্তেনের সঙ্গে ইংলণ্ডে এসে দিনকতক পাখিটি বড়ই বিষণ্ণ হয়ে থাক্‌ত, কিন্তু সেটা ক্রমে শুধ্‌রে এল। শেষে সে ইংরাজী শিখে স্পেন দেশী কথা সব ভুলেও গেল। এমনিভাবে অনেক বছর যায়। ততদিন বুড়ো থুরথুরে হয়ে বেচারার এমনি অবস্থা হল যে সে কিছু খেতে পারে না, এমন কি, ভাল করে দাঁড়ে উঠে বস্‌তেও পারে না। এমন সময় একদিন স্পেন দেশ থেকে একটি ভদ্রলোক সেই বাড়ীতে এলেন। তাঁর মুখে স্পেন-দেশী কথা শুনেই পাখীটির হঠাৎ সেই ছেলেবেলার সব কথা মনে পড়ছে। অমনি সে আনন্দে অধীর হয়ে পাখা মেলে চীৎকার করে উঠ্‌ল, আর সেই ছেলেবেলায় যে সব স্পেনদেশী কথা শিখেছিল অনেক বছর ধরে যার একটি বর্ণও বলে নাই, সেই কথাগুলি আওড়াতে আওড়াতে মরে গেল।

ব্রেজিল দেশে একটা টিয়া নাকি এমনি বুঝে শুনে কথার উত্তর দিতে পার্‌ত যে তা শুনে সে দেশের শাসনকর্ত্তা সেটাকে দেখবার জন্য আনালেন। পাখীটা এসেই সেখানে অনেক সাহেব দেখে বল্ল, "কত সাহেব!" শাসনকর্ত্তাকে দেখিয়ে সকলে জিজ্ঞাসা কর্‌ল "ইনি কে?" টিয়া বল্ল, "সেনাপতি হবে!" সে কোথা থেকে এসেছে, কার পাখী, সব সে শাসনকর্ত্তাকে বল্ল। শেষে শাসনকর্ত্তা জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "তুই কি করিস?" সে বল্ল, "মুরগীর ছানা দেখি।" শাসনকর্ত্তা হেসে বল্লেন, "তুই মুরগীর ছানা দেখিস্‌?" সে বল্ল, "হাঁ, খুব পারি।" এই বলে ঠিক মুরগী যেমন করে তার ছানাদের ডাকে, তেমনি শব্দ করতে লাগ্‌ল।

আর একটা টিয়ার মাথা গরম জলে ঝলসে্‌ নেড়া হয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকে সে টাকপড়া লোক দেখ্‌লেই বল্‌ত, "মাথা ঝল্‌সে গেছে!"

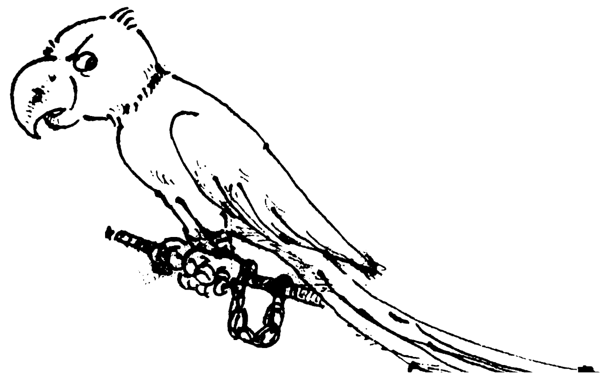

জেম্‌স

তাপস কুমার

সে প্রায় আজ থেকে দু'শো বছর আগেকার ঘটনা। আমেরিকার একটা স্কুলে সেখানকার অধ্যক্ষ এবং অন্যান্য স্কুল পরিচালকরা বসে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ে আলোচনা করছিলেন। এমন সময় একটি কিশোর ঘরে ঢোকার অনুমতি প্রার্থনা করল সেখানে এসে।

অনুমতি পেলে কিশোরটি দৃঢ় পদক্ষেপে এসে ঢুকল অধ্যক্ষের ঘরে। বলল 'স্যার, আমি একজন গরীব কৃষকের ছেলে। নাম জেম্‌স। আমরা অরেঞ্জ পল্লীতে থাকি। পড়াশোনা করার ইচ্ছে আমার খুব, কিন্তু পড়াশোনার খরচ যোগানোর মত পয়সা নেই বাবার। যদি স্যার আপনার স্কুলে একটা ঝাড়ুদারের বা ফাইফরমাস খাটার কাজও দেন, আমি করব। তার বদলে শুধু এই স্কুলে আমায় পড়াশোনা চালানোর অনুমতি দিলে দেখবেন স্যার, ঝাঁট দেওয়া বা চাকরের কাজ আমি খুব ভালো পারি।'

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে ছেলেটি চুপ করল। পরিচালকমণ্ডলী আর স্বয়ং অধ্যক্ষ মহাশয় অবাক হয়ে ছেলেটিকে দেখছিলেন। এমন বলিষ্ঠভাবে ক'জন নিজের অবস্থার কথা, মনোবাসনার কথা সকলের সামনে বলতে পারে? তার ওপর আবার দয়া প্রার্থনা নয়, চাকরের কাজ করার বিনিময়ে পড়াশোনা করার বাসনা!

পরিচালকমণ্ডলীর একজন বয়সের কথা তুলতেই ছেলেটি বলল 'ছোট হলে কি হবে স্যার, ঝাঁট দেওয়ার কাজ আমি খুব ভালো পারি। কাজে আমার কোনো অবহেলা পাবেন না।'

অগত্যা রাজি হতেই হল কর্তৃপক্ষকে।

ভৃত্য এবং ছাত্ররূপে জেম্‌স স্থান পেল সেই স্কুলে। ভৃত্য হিসেবে ঘর ঝাঁট দেওয়া, ঘণ্টা বাজানো এই সব কাজ, আর ছাত্র হিসেবে পাঠে গভীর মনোনিবেশ।

মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই স্কুল কর্তৃপক্ষ ছেলেটির প্রতিভার সন্ধান পেলেন। আশ্চর্য! যেমন নিখুঁত ভৃত্যের কাজ তেমন অপরিসীম যত্নে লেখাপড়া চালানো কোথাও কোনো খুঁত নেই। পড়াশোনার দোহাই দিয়ে কাজে অবহেলা

নেই, কাজের অজুহাত দেখিয়ে পাঠে অমনোযোগ নেই। মাত্র এক মাসের মধ্যেই স্কুলে সুনাম ছড়িয়ে পড়ল ছেলেটির।

কর্তৃপক্ষ ছেলেটিকে ভৃত্যের কাজ থেকে অব্যাহতি দিতে চাইলেন। কিন্তু সে রাজি হল না। দুর্দম মানসিক শক্তিতে অপরিসীম নিষ্ঠায়, অদ্ভুত দক্ষতায় সে সব কাজ করে যেতে লাগল।

এই নিষ্ঠাবান জেম্‌স কে জানো? ইনি হলেন জেম্‌স গারফিল্ড। ১৮৮০ সালে আমেরিকাবাসীরা তাঁকে যোগ্য সম্মানে ভূষিত করেন। নির্বাচন করেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি হিসেবে।

হাসি-কান্না হীরে-পান্না

ভবানীপ্রসাদ মজুমদার

পড়ার সময় হঠাৎ খোকা
বইটা বুকে ধ'রে,
হা-হা, হো-হো, হি-হি ক'রে
উঠলো হেসেই জোরে।

মা বললেন, মাথাটা তোর
খারাপ হলো নাকি?
সাত সকালেই বোকার মতন
হাসির কারণটা কি?

বললে খোকা, মোটেই বোকা
নইকো আমি মাগো,
কারণটা না বুঝে মিছেই
আমার উপর রাগো।

এই দ্যাখো কি বইতে লেখা—
'কাজের ফাঁকে-ফাঁকে,
প্রাণটি ভ'রে হাসলে জোরে
স্বাস্থ্য ভালো থাকে!'

পাশের ঘরে হঠাৎ খুকু
দু' চার পাতা প'ড়ে,
ভেউ-ভেউ-ভেউ, ভেউ-ভেউ-ভেউ
উঠল কেঁদেই জোরে।

মা বললেন, হায়-হায় হায়
তোর কি হলো আবার?
লাগলে ক্ষিদে আয়-খাবি-আয়
তৈরি আছেই খাবার।

রেগেই খুকু বললে, আমায়
ভাবছো পেটুক মেয়ে,
কাঁদার কারণ শুনবে নাকি?
এই দ্যাখো চোখ চেয়ে।

এই লেখাটা পড়লে কারণ
বুঝবে হাড়ে-হাড়ে,
'পরাণ খুলে কাঁদলে চোখের
দৃষ্টিশক্তি বাড়ে!!''

শাইলকের শহরে কয়েকদিন

ইন্দ্রানী হালদার

দ্বিতীয় দিনের সকালে স্নান সেরে তৈরী হয়ে গরম কফি আর চীজ-ছড়ানো পিৎসা সহযোগে তারিয়ে তারিয়ে ব্রেকফাস্ট সারছি হোটেলের কাফেটেরিয়াতে একা বসে, এমন সময় গুদ্‌রুন্‌ এসে হাজির রাগে গর্‌গর্‌ করতে করতে। সমুদ্রের হাওয়ায় তার ঘুমটা না' হয় একটু বেশীই হয়েছিল, তাই বলে কি আমি তাকে তুলে দিতে পারতাম না? ভারতীয়রা যে এত স্বার্থপর তা সে ধারণাও করতে পারেনি! বরফের দেশের বরফকন্যার মেজাজ ঠাণ্ডা হতে অবশ্য বেশীক্ষণ লাগলো না। শুধু একটার জায়গায় দুটো পিৎসা সাবাড় করতে যা দেরী। গাইড-বই দেখে আজ আমরা স্থির করলাম যে প্রথমেই সেণ্ট মার্কস্‌ স্কোয়ারের এক পাশে ডোজে বা ডিউকের প্রাসাদটি দেখবো খুঁটিয়ে। সেই মতন বেরিয়ে

পড়লাম গ্র্যাণ্ড কানালের গায়ে-লাগানো রাস্তা ধরে।

গ্র্যাণ্ড কানালের দিক থেকে ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে উঠলে সেণ্ট মার্কের চত্বরে ঢোকার মুখেই রয়েছে আর একটি ছোট চত্বর। তারই পাশে প্রাসাদটি। নীল জল, সোনালি গম্বুজ, গোলাপী প্রাসাদ—সব কিছুর উপর সকালের আলোর খেলা চত্বরটিকে যেন রূপকথার রাজ্য করে তুলেছে। দুটি মিনারের একটির মাথায় পাহারা দিচ্ছে সেণ্ট মার্কের প্রতীকী সিংহ। অন্য দিকের লাল মিনারটির চূড়োয় কুমীরের উপর দাঁড়িয়ে আছেন সন্ত থিয়োডর, নবম শতাব্দী পর্যন্ত যিনি ছিলেন ভেনিসের রক্ষাকর্তা। ৮২৯ খৃণ্টাব্দে ভেনিসের চরেরা আলেক্‌জান্দ্রিয়া থেকে সেণ্ট মার্কের দেহটি চুরি করে আনার পর অকৃতজ্ঞ ভেনিসবাসী থিয়োডরকে ভুলে মার্কের শরণাপন্ন হয়। তারপর তাঁর দেহাবশেষ উপযুক্ত মর্যাদার সংগে রাখার জন্য তৈরী করে সেণ্ট মার্কের গীর্জা!

প্রায় এগারো'শ বছর ধরে ভেনিসের শাসন-যন্ত্র যে মানুষটির হাতে ছিল তাঁকে বলা হ'ত ডোজে বা ডিউক। অবশ্য গুদ্‌রুনের মুখে শুনলাম যে শেষের পাঁচশো বছর সমস্ত ক্ষমতা আসলে চলে গিয়েছিল মুষ্টিমেয় ক'টি রাজপুরুষের হাতে, ডোজেকে শিখণ্ডী করে যাঁরা রাষ্ট্র-পরিচালনা করতেন! কঠোর হাতে দুষ্টের দমন ছিল তাঁদের নীতি। শহরের নানা জায়গায় বসানো পাথরের সিংহের মুখে ফেলে-যাওয়া বেনামী চিঠির ভিত্তিতেই তাঁরা অনেক সময়ে অপরাধীকে সনাক্ত ও বিচার করতেন। তাই ডোজের প্রাসাদের অন্ধকার কারাগারে বন্দীদশায় জীবন শেষ হয়েছে বহু মানুষেরই। যে সাঁকোটি পার করে বন্দীদের কারাগারে নিয়ে যাওয়া হ'ত সেটিকে আজও 'Bridge of sighs' বা 'দীর্ঘশ্বাসের সাঁকো' বলা হয়। এই ঢাকা সাঁকোটির ঘুলঘুলির ফাঁক দিয়ে হতভাগ্যেরা শেষ বারের মতন তাদের চেনা জগৎকে দেখে নিত।

প্রাসাদটি কিন্তু বড় যত্নে তৈরী। প্রদীপ-শিখার মতন উর্ধ্বমুখী গথিক্ তোরণের সারি তুলে ধরেছে নক্‌শাকাটা অসংখ্য থামকে। থামগুলি আবার ফুলের বোঁটার মতই একটি করে চার-পাপড়ি ফুল ফুটিয়ে তুলেছে মাথার উপরে। সবার উপরের তলাটি সাদা গোলাপী জ্যামিতিক নক্‌শায় সাজানো। চোখ ফেরানো যায় না প্রাসাদের ভিতরের সৌন্দর্য থেকেও। প্রশস্ত আঙিনাটির এক পাশে চওড়া সিঁড়ি উঠে গিয়েছে—এটিকে বলা হয় 'Staircase of the Giants'। দুধারে পাহারায় দাঁড়িয়ে দৈত্যাকৃতি দুই দেবতা—সাগরদেব নেপচুন্ আর সমররাজ মার্স। ঘরে ঘরে জ্বলজ্বলে রঙে আঁকা ছবির সমারোহ। রেনেসাঁস-শিল্পী তিনতোরেত্তোর ছবিগুলির আশ্চর্য রঙের জৌলুষ দেখে তো মনে হয় ভেনিসের জল আর আলো থেকেই শুষে নেওয়া হয়েছে ও রঙের সমস্ত যাদু। প্রাসাদের দেয়াল জুড়ে ছবি এঁকে গিয়েছেন জর্জিয়োনে, জোভান্নি বেল্লিনি ও কারপাচ্চিও। আর স্বনামধন্য টিশিয়ান

তো বিশেষভাবে ভেনিসেরই শিল্পী!

সারাদিন ধরে প্রাসাদের ঘরগুলি ঘুরে ছবি আর ভাস্কর্যের সৌন্দর্যে চোখ আর মন তৃপ্ত করে পড়ন্ত বেলায় আমাদের মনে হ'ল এবার রসনারও তৃপ্তি প্রয়োজন। বাজারের ছোট্ট একটি রেস্তরাঁয় ঢুকে দেখলাম চমৎকার গুলাশ বা মাংসের পোলাও পাওয়া যাচ্ছে। ভেনিসে রান্নাতেও প্রাচ্যের প্রভাব সুস্পষ্ট। এ রান্না গুদ্রুনের বিশেষ পছন্দ না হলেও আমার বাঙালী-মন তো মশলার সুগন্ধে একেবারে তর হয়ে গেল। তবে ঝাল খেয়ে গুদ্রুন্ বেচারা নাকের জলে চোখের জলে!

ভেনিস-সফরের তৃতীয় দিনটি আমরা রেখে-ছিলাম দ্বীপ পরিক্রমার জন্য। ভেনিস আসলে অনেকগুলি ছোট-বড় দ্বীপের সমষ্টি। তার শহর-সীমার অন্তর্গত দশটি আলাদা দ্বীপ। আমরা ঠিক করেছিলাম, যে ক'টি দ্বীপের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে, সে ক'টি অন্ততঃ ঘুরে দেখবো। তাই ভোরের আলো ফোটার সংগে সংগেই আমরা আগের সন্ধ্যায় কিনে রাখা কমলালেবু, চীজ, আর রুটি ঝোলায় ভরে নিয়ে ভাপোরেডোয় চড়ে পাড়ি দিলাম তর্চেল্লো দ্বীপে। এখান থেকেই এক সময়ে ভেনিসের সাম্রাজ্যশাসন চলতো। শাসন-যন্ত্র রিয়ালটোতে চলে যাবার পর একদা কর্মমুখর দ্বীপটি বড় নির্জন হয়ে পড়লো। অতীতের স্মৃতি সম্বল করে এখানে আজও দাঁড়িয়ে আছে সপ্তম শতাব্দীতে তৈরি একটি গীর্জা। বাইরের চাক-চিক্য নেই তবু গীর্জার ভিতরটি বাইজেন্টাইন রঙীন মোজেইকের অসংখ্য ছবিতে উজ্জ্বল।

এরপর ভাপোরেডো আমাদের নিয়ে গেল তর্চেল্লো থেকে ক'ঢেউ দূরের বুরানো দ্বীপে। এটি প্রাণচঞ্চল জেলেদের দ্বীপ, রোদে শুকোচ্ছে মাছ-ধরা জাল আর কচ্ছপের মতন উল্টোনো জেলে ডিঙি। এই ছোট্ট দ্বীপটির মেয়েদের হাতের তৈরী লেসের কাজেরও কদর আছে দেশে-বিদেশে। পুরুষেরা যখন লেগুনে মাছ ধরে, মেয়েরা তখন মাছ-ধরা জাল আর লেস বোনে। এখানকার রেস্তরাঁয় টাট্কা ভাজা মাছ খেয়ে আজ গুদরুন্ ভারি খুশি। বললো আইস্ল্যাণ্ডে না কী এই রকম টাট্কা মাছই তারা খায়, ধরার ঘণ্টাখানেকের মধ্যে। বিলেতের বরফে-রাখা বাসি মাছকে তারা মাছই বলে না।

মুরানো দ্বীপটি আবার একেবারে অন্য ধরণের। এ দ্বীপের ছোট ছোট কারখানার চুল্লীতে সাতশো বছর ধরে তৈরী হয়ে আসছে সুন্দর সব কাঁচের জিনিস। আজও ঘরোয়া কারখানাগুলিতে সেই প্রাচীন প্রথায় অত্যন্ত যত্নের সংগে গন্গনে আগুনে গলিয়ে নলের মধ্যে আস্তে আস্তে ফুঁ দিয়ে কারিগর ফুটিয়ে তুলছেন কাঁচের ফুল, ঘেলাগ্লাসের ফুলদানী বা ছাইদানী। আমার ভারি পছন্দ হয়ে গেল ঘেলাগ্লাসের একটি ফুলদানী, টিউলিপ ফুলের আকারে তৈরী। বড্ড দাম, তবু ব্যাগের অবশিষ্ট লিরাগুলি দিয়ে কিনেই ফেললাম সেটিকে।

আর একটি দ্বীপের নাম সান্ মিকেলে। এটিতে রয়েছে ভেনিসের গোরস্থান। যদিও এখানে আমরা নামলাম না, ফেরিবোটে দ্বীপটির পাশ কাটিয়ে যাবার সময়ে চোখে পড়লো সাদা রঙের দেয়াল-ঘেরা কবরখানাটি। একটু দূরে চলেছে সারিবাঁধা গন্ডোলার শোকগম্ভীর শবযাত্রা। গন্ডোলাগুলি কালো কাপড়ে মোড়া!

পর্যটক হিসাবে গুদ্রুন্ বড়ই কর্ত্তব্য-পরায়ণ। ঐতিহাসিক তাৎপর্য আছে এমন কিছু দ্রষ্টব্যই সে বাদ দিতে চায় না। ফিরতি-পথে ম্যাপ দেখে টেনে নিয়ে গেল ভেনিসের আর্সেনালে বা জাহাজ-তৈরীর বিরাট কার-খানায়! তার মুখে শুনলাম, ষোড়শ শতাব্দীতে, ভেনিসের নৌ-বাণিজ্যের যখন রমরমা, তখন এ কারখানায় কাজ করতো ষোল হাজার নৌ-কারিগর। তুরস্কের সংগে যুদ্ধের সময়ে নাকি এই আর্সেনাল থেকেই একটি করে রণতরী বেরিয়ে এসেছিল একশো দিন ধরে প্রতিদিন। আজ অবশ্য এ কারখানার একেবারে দৈন্যদশা।

ভেনিস থেকে বিদায় নেবার দিনটি বড় তাড়াতাড়ি এসে গেল! এমন রোমান্টিক শহর ছেড়ে যেতে আমাদের দুজনের কারও মন চাইছিল না। তাই এলোমেলো ভাবে ঘুরে সমুদ্র-ধোওয়া শহরটির বৈচিত্র্যের আস্বাদ নিতে নিতে আর একবার পিয়াৎসা-চত্বরের কফি-টেবিলে এসে বসলাম। আজ দেখলাম পায়রাদের খাবার দেবার লোকটি তাদের দানা ছড়িয়ে দিচ্ছে, এ কাজের জন্যে সে মাইনে পায়। চত্বরের দোকানগুলিতে ট্যুরিস্টের ভিড়। ভারী সুন্দর প্রবালের ফুলের গয়না বিক্রী হচ্ছে চড়া দামে। পকেট হাল্‌কা থাকায় ও দিকে নজর দেওয়াও মানা। কাজেই মধুরেণ সমাপয়েৎ করার উদ্দেশ্যে আমাদের পা বাড়াতে হ'ল ভেনিসের সব চাইতে নাম করা চিত্রশালা, 'আকাদেমিয়া'র দিকে।

গ্র্যাণ্ড কানালের গায়ে-লাগানো এই আকা-দেমিয়ার সংগ্রহে রয়েছে ভেনিসের সব ক'জন নামজাদা শিল্পীর আঁকা ছবি। টিশিয়ানের গুরু জোভান্নি বেল্লিনি থেকে শুরু করে। তিনতোরেত্তো, জর্জিয়োনো, পাওলো ভেরোনিজে প্রভৃতি রেনেসাঁস শিল্পীদের ছবি তো আছেই, অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভেনিসের দ্বিতীয় রেনেসাঁসের শিল্পী কানালেত্তোর আঁকা সে যুগের ভেনিসের ক'টি নিসর্গদৃশ্যও এ চিত্রশালায় রক্ষিত রয়েছে সযত্নে। টিশিয়ানের দুটি বিখ্যাত 'মাদোন্না' বা যীশুমাতা মেরীর ছবি অবশ্য ভেনিসেরই ফ্রারি গীর্জায় রয়েছে, কিন্তু তার প্রভাবে আঁকা ভেরোনিজের "সেণ্ট ক্যাথারিনের বিবাহ" রয়েছে এই আকাদেমিয়াতেই। আর আছে টিশিয়ানের বিখ্যাত "পিয়েটা"। শিল্পীর শতাব্দী-দীর্ঘ জীবনের শেষ প্রান্তে আঁকা এ ছবিতে দেখি মৃত যীশুকে কোলে নিয়ে করুণার প্রতিমূর্তি মা মেরী, যাঁর একপাশে দাঁড়ানো বৃদ্ধটি টিশিয়ান স্বয়ং।

ভেনিসের চিত্রকলায় যা বিশেষ করে মন কাড়ে তা হ'ল জীবন সম্বন্ধে শিল্পীর আগ্রহ। এমন কি যে ছবিগুলির বিষয় ধর্মীয়, বাইবেল থেকে নেওয়া, সেগুলিতেও প্রতিদিনকার জীবনের খুঁটিনাটি ফুটিয়ে তোলার মধ্যে যেন অনির্বচনীয় এক আনন্দ পেয়েছেন শিল্পী। এ ছবি দেখে জীবনকে ভালো না বেসে উপায় নেই। তাই সবকে আপন করে নেওয়া এ শহর ছেড়ে গেলেও তার জীবনদর্শনকে ভোলা যায় না। গুদরুনের অবশ্য এর চাইতে পছন্দ টিশিয়ানের ছবির মেয়েদের লাল্‌চে—সোনালি চুল! নিজের স্লিপিং বিউটির মতন রূপোলি—সাদা, গাঢ় নীল চোখের সংগে মানানসই, চুল না কি তার একেবারেই না-পসন্দ!

এবার বিদায়ের পালা! আশ্চর্য সমন্বয়-ঘটন-পটিয়সী শহর এই ভেনিস! এক সময়ে যেমন এ শহর সাদরে ডেকে নিয়েছিল ইহুদী মহাজনদের, তেমনই রং-আলো-জলের মায়াজালে জড়িয়েছিল শিল্পী-চিত্রকরদের। বাণিজ্য-কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল শিল্প-চর্চার পীঠস্থান। আজও এই ভেনিসে এসেই বন্ধুত্বের জোরে বাঁধা পড়লো আইসল্যাণ্ডার ও ভারতীয়—একেবারে ভিন্ন দিগন্তের অধিবাসী দুটি মানুষ!

কালাচাঁদ বনাম পাগলা দাশু

কালাচাঁদ কতগুলো ছবি এঁকেছিল। পাগলা দাশুর ভারি পছন্দ হল, ঝটপট সেগুলো নকল করে নিল—হুবহু নকল। কিন্তু প্রোফেসর নিধিরাম পাটকেল বললেন, 'এ কি! এক একটা ছবিতে অনেক ভুল!' দাশু দেখলো, তাই ত!

একটা ছবি আমরা ছাপলাম, বাঁদিকেরটা কালাচাঁদের আঁকা আর ডানদিকের ছবিটা পাগলা দাশুর।

বলতে পার ভুলগুলো কি কি?

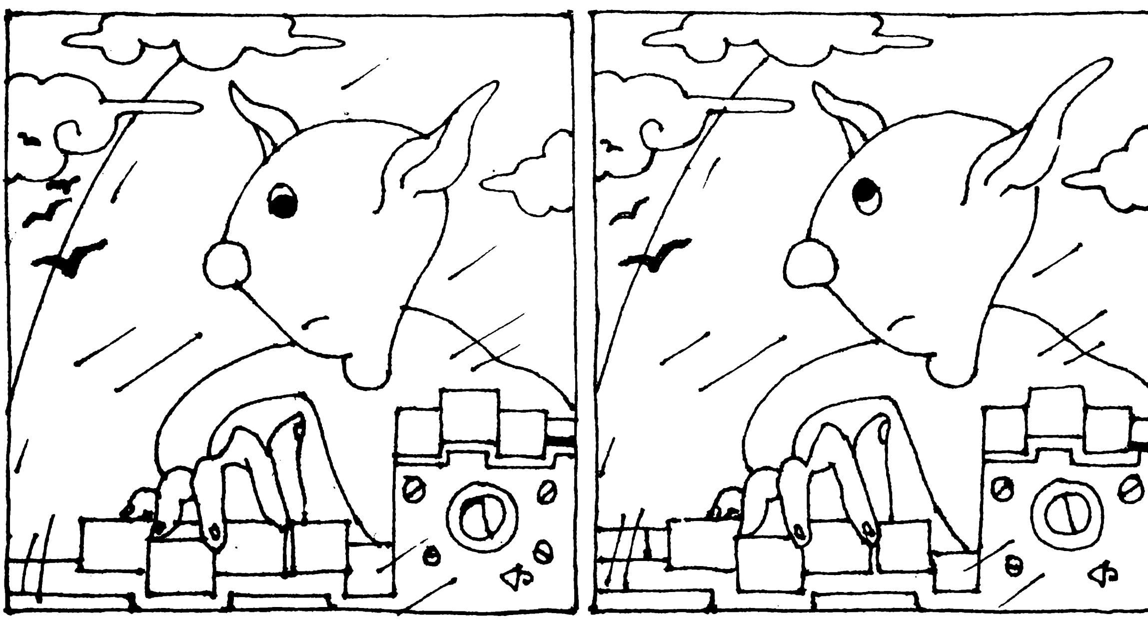

কালাচাঁদ বলল, 'এবারে টাকে—বা!'
প্রোফেসর উত্তর দিলেন, 'ভুমি আছি বলত!'

কে কি বলল বুঝতে পারলে?
না বুঝলে ১১১০ পৃষ্ঠা দেখ

বিচার

রাধিকা রঞ্জন চক্রবর্তী

ইতিহাসের এক কাহিনী।

হজরৎ ওমর তখন আরবের খালিফা। 'খালিফা' অর্থে ইসলাম ধর্মের ধারক। তিনিই আবার রাজ্যের শাসন কর্তা। এই খালিফাদের শাসনকালে এক সময় আরবের রাজশক্তি যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছিল। তাঁদের শাসন ব্যবস্থার সুখ্যাতি আরবের ভৌগোলিক সীমা ছাড়িয়ে দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল।

ওমর ছিলেন একজন ক্ষমতাপন্ন পুরুষ,-সুদক্ষ শাসক। তাঁর চরিত্রে কতকগুলি মহৎ গুণ ছিল। সেই মহত্বের ঐতিহ্য তাঁকে একটা বিশেষ যুগে মর্যাদার শ্রেষ্ঠ আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

প্রজাদের সুখ সুবিধার দিকে সব সময় নজর রাখতেন খালিফা ওমর। একদিন তাঁর মনে হল, রাজ কর্মচারীরা তাদের কাজগুলো ঠিকমত করছে কিনা দেখা দরকার। সংখ্যায় তারা অনেক। বিশাল রাজ্যের আনাচে কানাচে নানা কাজের দায়িত্ব নিয়ে ছড়িয়ে আছে। রাজকার্যে সহযোগিতা করা তাদের কাজ। কিন্তু তারা যদি সেই কাজে গাফলতি ক'রে বা শুয়ে ব'সে দিন কাটায়, তাহলে সত্যি চিন্তার কথা। রাজকর্মচারী আলসে হলে সে দেশের শাসন ব্যবস্থা কখনও ঠিক থাকতে পারে না। কাজে নানা গোলযোগ দেখা দেয়। সাধারণ মানুষের হয়রানি বাড়ে।

কথাটা চিন্তা ক'রে এক ফরমান জারি করলেন ওমর,—'কাজের প্রয়োজনে যে কোন সময় রাজকর্মচারীর কাছে কেউ সাহায্য বা পরামর্শ চাইতে এলে, তখুনি তার সহযোগিতা করতে হবে। মিথ্যে অজুহাত দেখিয়ে কাজের দায়িত্ব এড়ানো চলবে না। নির্দেশ অমান্য করলে বা দায়িত্ব পালনে কোন কর্মচারী অপারগ হলে, কঠিন শাস্তি।'

শুধু নির্দেশ জারি করেই খালিফা ক্ষান্ত হলেন না, কর্মচারীরা ঠিকমত সেই নির্দেশ পালন করছে কিনা, সহরের নানা-জায়গায় ছদ্মবেশে ঘুরে দেখতে লাগলেন। গভীর রাতে একলা টহল দিতেন খালিফা। লোকেরা তখন ঘুমত। কেউ তাঁর গতিবিধি টের পেতনা।

একদিন এক ঘটনা ঘটল। দিনটা ছিল শুক্রবার—জুম্মার দিন। তখন প্রায় অর্দ্ধেক রাত। সেই সময় একটি লোক হাজির হল কোতোয়ালের দরজায়। দরজায় কড়া নাড়তেই ঘরের ভেতর থেকে কোতোয়াল জিজ্ঞেস করল,—'কে?' লোকটা বলল, 'হুজুর, আমার নাম মকবুল। এই পাড়াতেই থাকি। দারুণ বিপদে পড়ে আপনার কাছে একটা নালিশ নিয়ে এসেছি। দয়া করে শুনুন।'

'এখন নয় ভাই, তুমি বরং সকালে এস। তোমার সব কথা শুনব। এ সময় কথা বলতে পারছি না, অসুবিধে আছে।'

কথাটা বলেই কোতোয়াল মুহূর্তে অদৃশ্য হল।

চারদিকে অন্ধকার। কোতোয়ালের সমস্ত বাড়িটাও অন্ধকার। সেই অন্ধকার বাড়িটার দিকে কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল লোকটা। তার মনে কেবল একটাই প্রশ্ন। কোতোয়ালের বাড়িতে আলো নেই কেন?

পরদিন সকালে লোকটা আর কোতোয়ালের সঙ্গে দেখা করল না। ঘর থেকে বেরিয়ে দেখল, কি যেন একটা দরকারী কাজে খালিফা সেদিন সাত সকালে তাদের পাড়ায় এসেছেন। কয়েকজন গণ্যমান্য লোকের সঙ্গে কি যেন শলা পরামর্শ করছেন। লোকটা সোজা তাঁর কাছে হাজির হল। তারপর গত রাত্রের সমস্ত ঘটনা খুলে বলল। ঘটনার কথা শুনে প্রচণ্ড রাগে ফেটে পড়লেন খালিফা ওমর। চীৎকার ক'রে বলে উঠলেন, কে সেই কোতোয়াল? তার মত নিষ্কর্মা লোক আমার দরকার নেই। এখুনি তাকে খবর পাঠাও। আমি শুনতে চাই, কোন সাহসে সরকারী নির্দেশ সে অমান্য করেছে।'

খালিফার ঐ অগ্নি মূর্তি দেখে লোকেরা তটস্থ। কয়েকজন লোক তখুনি কোতোয়ালকে খবর দিতে ছুটল। অনেকে ভাবল, না জানি আজ কি অঘটন ঘটে! বেচারা কোতোয়ালের কপালে কি আছে, কে জানে?

আদেশ শুনে কিছুক্ষণের মধ্যেই কোতোয়াল এসে পৌঁছুল। কুর্ণিশ ক'রে দাঁড়াল খালিফার সামনে। পাড়ার লোকেরা একে একে জড়ো হল সেখানে। দেখতে দেখতে লোকের ভিড়ে জায়গাটা গম গম করতে লাগল।

কোন নির্দিষ্ট আদালত কক্ষে নয়, পাড়ার একটা খোলামেলা জায়গাতেই বিচার সুরু করলেন ওমর। ফরিয়াদী মকবুলের দিকে আঙুল দেখিয়ে কোতোয়ালের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে বলে উঠলেন, 'লোকটির দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন, জনাব। লোকটি আপনার চেনা। গতরাত্রে একটা অভিযোগ নিয়ে বিচারের আশায় আপনার কাছে গিয়েছিল। আপনি তার কোন কথা না শুনে সরাসরি বিদায় দিয়েছেন। এমন কি আজ সকাল পর্যন্ত লোকটার কথাগুলো শোনার সময় পান নি। এখন সকলের সামনে বলুন, লোকটির প্রয়োজন জেনেও কেন তাকে উপেক্ষা করেছেন?' কোতোয়াল এতক্ষণ মাথা নিচু ক'রে খালিফার কথাগুলো শুনছিল। কথা শেষ হতেই বিনীত সুরে উত্তর করল, 'হুজুর গতরাত্রে আমার অসুবিধে ছিল। তাই লোকটিকে সকালে আসতে বলেছিলাম; কিন্তু সে আর আসেনি। তার জন্যে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষাও করেছিলাম। পরে খবর পেলাম, তার ব্যাপারে আপনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। আপনি যে আজ এখানে থাকবেন, আগে খবর পাইনি। খবর পেলে অনেক আগেই দেখা করতাম।'

'আমার প্রশ্ন তা নয়। গতকাল কি কারণে লোকটির অভিযোগ শুনতে চান নি?'

'আমার কোন উপায় ছিল না, হুজুর। বিশ্বাস করুন, একান্ত নিরুপায় না হলে আমি কখনো

লোকটিকে বিদায় দিতাম না।'

'আহা, কি এমন অসুবিধে ছিল, বলুন না? আপনার সামান্য অসুবিধার জন্য ঐ গরীব লোকটার কত লোকসান হয়েছে, জানেন? সমস্ত রাত সে নাকাল হয়ে ঘুরেছে, কত কষ্ট পেয়েছে, দুশ্চিন্তায় ছটফট করেছে। তার জন্য আপনার কি কোন দুখ দরদ নেই?' একটানা কথাগুলো জোর গলায় বলে গেলেন ওমর। ভাবলেন, শাস্তির ভয়ে কোতোয়াল আসল কথাটা এড়িয়ে যাচ্ছে। তার অসুবিধের কথাগুলো কিছুতেই প্রকাশ করতে চাইছে না। লোকটা শুধু অপদার্থ নয়, বেয়াদপও বটে। কথার জের টেনে তিনি আবার বলে উঠলেন,

'কি, চুপ ক'রে রইলেন কেন? বলুন, কি আপনার অসুবিধে ছিল?'

'যা ঘটেছে, তার জন্যে আমি অনুতপ্ত জাঁহাপনা। তবে নেহাৎ অসুবিধে না থাকলে কখনই আমি এ কাজ করতাম না।'

'আবার সেই কথা! আরে সেই অসুবিধার কথাই ত জানতে চাইছি?'

কোতোয়াল এবার বেশ কিছুটা বিব্রত বোধ করল। লোকজনের মাঝে অসুবিধের কথাটা সে কিছুতেই বলতে পারছে না; অথচ খালিফা বার বার তাগিদ দিয়ে সেটা শুনতে চাইছেন। এ এক ধরনের অপমান। প্রকারান্তরে খালিফা সকলের সামনে তাকে অপমান করতে চাইছেন। ব্যাপারটা আদৌ তলিয়ে না দেখে নিজের জিদটাকে বড় ক'রে দেখছেন। কোতোয়াল ভাবল, খালিফা যখন কিছুতেই তাকে রেহাই দেবেন না, তখন কথাটা অন্য কানে না দিয়ে তাঁকেই চুপিসারে বলা ভাল। সেই ভেবে বিনীত সুরে একটা প্রার্থনা জানিয়ে বলল,

'মেহেরবান, অসুবিধের কথাটা আপনাকে আড়ালে বলতে চাই। সকলের সামনে বললে আমার মান-সম্মান, কিছু থাকবে না। এমন কি যে পদে কাজ করছি, তার মর্যাদা বা গুরুত্ব কোনটাই থাকবে না।'

'ভুলে যাবেন না, পদ মর্যাদা নির্ভর করে কাজের ওপর। কাজে ফাঁকি দিলে মান-সম্মান পদ মর্যাদা কিছুই থাকে না। জনসাধারণের সেবা করাই আপনার কাজ, তাদের হেনস্তা করা নয়। আপনি অন্যায় করেছেন। যাদের কাছে অন্যায় করেছেন তাদের সকলের সামনে অন্যায়ের কারণ খুলে বলতে হবে। আড়ালে আমার কাছে বললে চলবে না।'

কোতোয়ালের মুখখানি নিমেষে মলিন হয়ে উঠল। চোখ দুটি জলে ভরে উঠল। এক নিদারুণ লজ্জা আর অনুশোচনা মনকে আচ্ছন্ন করল। পাষাণ মূর্তির মত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সে। তারপর সরল সত্যের ছায়ায় মনস্থির করে শান্ত গলায় বলে উঠল, 'হুজুর, তাহলে শুনুন; আমার কেবল এক জোড়া জামা-কাপড় ছাড়া পরনের কিছু নেই। সপ্তাহের ছ'টা দিন ওগুলো ব্যবহার করি। জুম্মার দিন অর্থাৎ শুক্রবার আমাদের ছুটির দিন। ঐ দিন রাত্রে জামা-কাপড় দু'টো কেচে শুকিয়ে নিই। আমার ঐ মকবুল বন্ধুটি সেদিন যে সময় আমার বাড়িতে গিয়েছিল, তখন অর্দ্ধেক রাত। আমার জামা কাপড়গুলো তখনও শুকোয় নি। সমস্ত বাড়িটা তাই অন্ধকার করে বসেছিলাম। ঐ অবস্থায় বাইরে কারো সাথে দেখা করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। আশা করি এবার আমার অসুবিধের ব্যাপারটা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন, মেহেরবান, তাই ইচ্ছে ক'রে নয়, নিতান্ত নিরুপায় হয়েই লোকটিকে সেদিন বিদায় দিয়েছিলাম। তবে এক্ষেত্রে যদি লোকটির কোন রকম মনোকষ্টের কারণ হয়ে থাকি, আমি তার কাছে ক্ষমা চাইছি।'

কোতোয়ালের কথা শুনে সকলে স্তম্ভিত। সকলের মনে তখন একটাই প্রশ্ন, যে লোক এত বড় চাকুরে তার মাত্র এক জোড়া জামা-কাপড়। খালিফা তখন রীতিমত বিচলিত। মনে হাজারো প্রশ্ন। বলে কি কোতোয়াল?

'আপনার মাত্র এক জোড়া জামা-কাপড়!

এই রকম দুরবস্থা! কেন, আপনি মাইনে পান না?' অবাক সুরে প্রশ্নগুলো ছুঁড়ে দিলেন খালিফা।

'পাই, মালিক। তবে যতটুকু প্রয়োজন তার বেশী কোন সময় নিই না। বাড়তি টাকা খাজাঞ্চির কাছে জমা রেখে গরীবদের মধ্যে ভাগ ক'রে দিতে বলি। এ অঞ্চলে কতকগুলো লোক আছে, যারা বড় গরীব। প্রায় খাওয়া জোটে না। ওদের কষ্ট চোখে দেখা যায় না। হুজুর।'

'বুঝলাম। কিন্তু আপনার জামা-কাপড় আরও দরকার। অন্তত দু' জোড়া না হলে কাজ করবেন কি ক'রে? আচ্ছা, আপনার মাইনে আর কিছু বাড়িয়ে দিচ্ছি।'

'আপনার অনেক দয়া, জাহাপনা। আমি যে রকমটি আছি, তাতেই সুখী। এর বেশী দরকার নেই। আমার কাছে এক জোড়া জামা কাপড় যথেষ্ট। আমি যে অঞ্চলের কোতোয়াল, সেখানে অনেকের এক জোড়া জামা কাপড়ও নেই।'

কথাগুলো শুনে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লেন খালিফা ওমর। রাজ্যে যখন এরকম সৎ এবং সজ্জন কর্মচারী আছে, তখন আর ভাবনা কিসের? তিনি নিশ্চিন্ত, সর্ব নির্ভয়। হঠাৎ সানন্দে অধীর হয়ে কোতোয়ালকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন ওমর। দুটো চোখে খুশির আলো। দীপ্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'সাবাস!' তারপর ফরিয়াদী মকবুলকে শুনিয়ে বললেন, 'ভাই, কোতোয়ালকে আমি ক্ষমা করলাম। তুমিও ওকে ক্ষমা কর।' লোকটি বলল, 'ক্ষমা নয় হুজুর, আমি ওঁকে সেলাম জানাচ্ছি। অনেক অনেক সেলাম।'

বিচার শেষে হাসিমুখে বিদায় নিলেন ওমর। উচ্ছসিত জনতা কোতোয়ালের প্রশংসায় হর্ষধ্বনি ক'রে উঠল।

কি আর তফাৎ

সুনীতি মুখোপাধ্যায়

আলুর দমে, আলুর দামে
তফাৎ শুধু আ-কার,
কাকের সঙ্গে যেমন একটু
তফাৎ থাকে কাকার।
জামার সঙ্গে জামাই, কেবল
ফারাক হ্রস্ব-ই-র,
মামার সঙ্গে মামীমার তো
তফাৎ শুধু মী-এর।
হ্রস্ব-উ-তে তফাৎটুকু
দাদের সঙ্গে দাদুর,
একই রকম তফাৎ দেখি
চাঁদের সঙ্গে চাঁদুর।
আ-কারটুকুর তফাৎ মেলে
টাকা এবং টাকে,
সমান তফাৎ বাংলা দেশের
ঢাকা এবং ঢাকে।
নরে এবং বানরেতেও
তফাৎ শুধু বা,
চায়ের সঙ্গে চাচার তফাৎ
একটা বেশী চা।

জয়পুরের মানমন্দির

নিরঞ্জন সিংহ

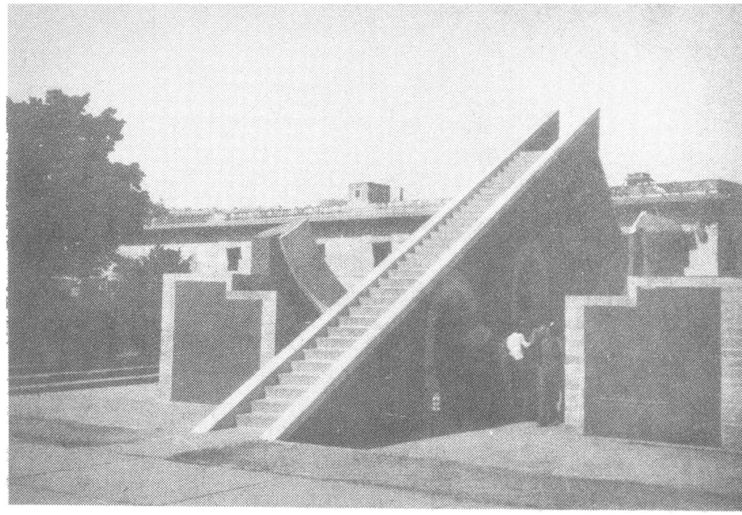

জয়পুর শহর প্রতিষ্ঠাতা মহারাজা সোয়াই জয়সিংহের তৈরি পাঁচটি মানমন্দিরের মধ্যে বারাণসীর মানমন্দির সম্পর্কে তোমাদের কাছে আগেই আলোচনা করেছি (সন্দেশ ফাল্গুন সংখ্যা ১৩৯৪)। আশা করি সেকথা তোমরা এরই মধ্যে ভুলে যাওনি। সে সময় আলোচনা প্রসঙ্গে জয়পুরের মানমন্দির সম্পর্কে বলেছিলাম, 'নিজের রাজধানী জয়পুরের রাজপ্রাসাদের কাছে তৈরি করান জয়পুরের মানমন্দির ১৭৩৪ খ্রীস্টাব্দে।'

১৯৮৭ তে পুজোর পর জয়পুর বেড়াতে যাওয়ার একটা সুযোগ ঘটে গেল। স্বভাবতই জয়পুরে পা দিয়েই প্রথমে ছুটলাম মানমন্দিরের দিকে। বছর পনেরো আগে এই মানমন্দিরটি দেখার প্রথম সুযোগ ঘটেছিল। এই মানমন্দিরটির অবস্থান রাজবাড়ির অংশ বলেই গণ্য করা হত। মহারাজা জয়সিংহ নিজে এখানে গ্রহনক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করতেন।

মহারাজা জয়সিংহ যিনি সোয়াই জয়সিংহ নামেই অধিক পরিচিত তিনি জন্মগ্রহণ করেন ১৬৮৬ খ্রীস্টাব্দে। খুব অল্প বয়সে অম্বরের সিংহাসনে বসেন। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর ১৭০৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি সমগ্র রাজ্যের অধিকার লাভ করেন। শাসনকর্তা, সৈন্যাধ্যক্ষ ও পণ্ডিত হিসেবে তিনি খ্যাতিলাভ করেন। রাষ্ট্রনীতিতে প্রখর জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার জন্য এই সময়ে তিনি ম্যাকিয়াভিলি নামে অভিহিত হতেন। ১৭১৯ খ্রীস্টাব্দে দিল্লী সম্রাট মহম্মদ শাহ কর্তৃক আগ্রা ও মালবের শাসনকর্তারূপে নিযুক্ত হন।

অল্প বয়স থেকে জয়সিংহ গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে আকৃষ্ট হন। অবিরাম পড়াশুনার মধ্য দিয়ে তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানের নিয়মনীতি আয়ত্ত করেন। তখনকার দিনের জ্যোতির্বিজ্ঞানের সারণী ত্রুটিপূর্ণ বলে তিনি নিজে এর সংশোধন ও সংস্কারে মন দেন। দিল্লীর মানমন্দিরে সাত বছর ধরে নিজে গ্রহনক্ষত্রাদি পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা করে জ্যোতির্বিজ্ঞানের নতুন সারণী তৈরি করেন। এই সারণী সঠিক কিনা তা যাচাই করার জন্য জয়পুর, মথুরা ও উজ্জয়িনীতে মানমন্দির স্থাপন করেন এবং ওইসব মানমন্দিরের পর্যবেক্ষণ-লব্ধ ফলাফল মিলিয়ে দেখেন।

যাই হোক মহারাজা জয়সিংহ জয়পুর শহরটি তৈরি করান ১৭২৮ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ। গোলাপী রঙের পাথর দিয়ে তৈরি গোটা শহরটির পরিকল্পনা সত্যিই অভিনব। জয়পুর শহরের পরিকল্পনা ও প্রধান স্থপতির গুরুদায়িত্ব ছিল একজন বাঙালীর উপর। জয়পুরের আর এক নাম 'পিঙ্ক সিটি' বা গোলাপী শহর। যাহোক অন্য কোন এক সময়ে এই প্রায় তিনশ বছরের পুরোনো নগর-পরিকল্পনা সম্পর্কে তোমাদের বিশেষভাবে জানাতে চেষ্টা করব।

এখন আমরা আবার ফিরে আসি মানমন্দির প্রসঙ্গে। এই মানমন্দিরের বর্ণনা প্রথম বোধহয়

লিপিবদ্ধ করেন একজন জেসুইট পাদ্রী। নাম তাঁর টিফেনথ্যালার (Tieffenthaller) ইনি ভারতভ্রমণ শুরু করেন ১৭৪৩ খৃীস্টাব্দে (এই বছরই মহারাজা জয়সিংহ মারা যান) এবং ৪৩ বছর ধরে টিফেনথ্যালার ভারতের বিভিন্ন জায়গা ঘোরেন। জয়পুরের মানমন্দির সম্পর্কে ইনি বলেছেন ঃ

> এই জায়গাটি সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন আছে। এখানেই জ্যোতিবিজ্ঞান সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণের কাজ চলত। এই মানমন্দিরের মত আর কোন মানমন্দির পৃথিবীর এই প্রান্তে আমার চোখে পড়ে নি। এখানকার যন্ত্রপাতিগুলি যেমন বিশাল তেমনি অভিনব যা দেখলে যে কোন মানুষই বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়বে। এই বিশাল ও প্রশস্ত মানমন্দিরটি রাজপ্রাসাদের একেবারে সামনেই বলতে গেলে। মানমন্দিরটি সমতলভূমির উপর তৈরি এবং পাঁচিল দিয়ে ঘেরা।

জয়পুর মানমন্দিরের পর্যবেক্ষণ-যন্ত্রপাতিগুলি ইট-চুন-সুরকি এবং ধাতুর তৈরি। এদের পরিচয় নিচে দেওয়া হল।

ইট-চুন-সুরকি দিয়ে তৈরি যন্ত্রপাতি ঃ

সম্রাট যন্ত্র ঃ দুটি, একটি বিশাল অন্যটি ছোট।

ষষ্ঠাংশ যন্ত্র ঃ দুটি, বড় সম্রাট যন্ত্রের দুপাশে।

রাশিবলয় যন্ত্র ঃ বারটি।

জয়প্রকাশ যন্ত্র ঃ একটি।

কপাল যন্ত্র ঃ একটি।

রামযন্ত্র ঃ দুটি।

দিগংশযন্ত্র ঃ একটি।

নাড়িবলয় যন্ত্র ঃ একটি।

দক্ষিণোরত্তি যন্ত্র ঃ একটি।

ধাতুর তৈরি যন্ত্রপাতি :

চক্রযন্ত্র

ক্রান্তিযন্ত্র

উন্নতংশ যন্ত্র

যন্ত্ররাজ বা এ্যাস্ট্রোল্যাব

এইসব যন্ত্রপাতিগুলির কার্যকারিতা সম্পর্কে আলোচনা করা এই প্রবন্ধের পরিসরে সম্ভব নয়। কেবল সম্রাটযন্ত্র সম্পর্কে একটু আলোচনা করব।

ভারতবর্ষে জ্যোতিবিজ্ঞানের চর্চা সেই

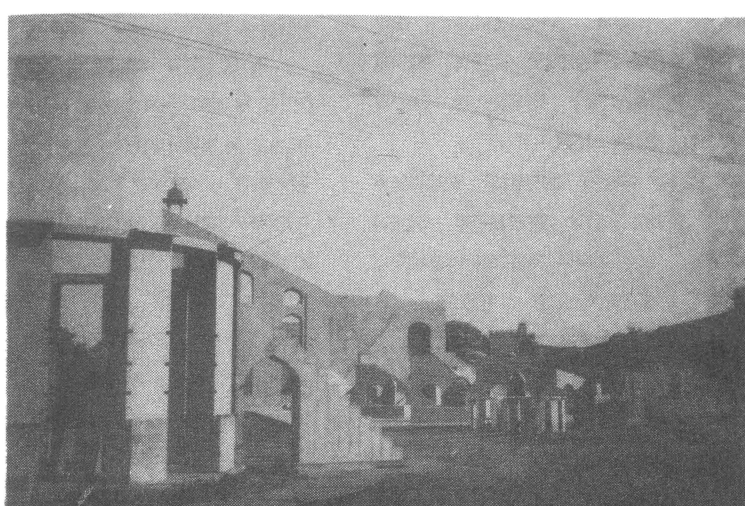

ঋগ্বেদের কাল থেকে। জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চ্চার জন্য যন্ত্রপাতির ব্যবহারের কথাও আমরা নানা প্রাচীন জ্যোতির্বিজ্ঞানের গ্রন্থ থেকে জানতে পারি। প্রাচীনতম পর্যবেক্ষণ যন্ত্রের কথা ঋগ্বেদেই আছে। এই যন্ত্রটির নাম "তুরীয়"। এই যন্ত্রটির সাহায্যে অত্রিমুনি সূর্যগ্রহণের রহস্য উদ্ঘাটন করেন বলে পণ্ডিতরা মনে করেন। আরো যেসব পর্যবেক্ষণযন্ত্রের নাম জানতে পারা যায় সেগুলি হচ্ছেঃ ঘটীযন্ত্র, জলযন্ত্র বা কপালযন্ত্র, শঙ্কুযন্ত্র, চক্রযন্ত্র, যষ্টিযন্ত্র ফলকযন্ত্র, স্বয়ংবহযন্ত্র ইত্যাদি।

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে নভোমণ্ডল পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার জন্য কোন মানমন্দির ছিল কিনা তা জোর দিয়ে বলা সম্ভব নয়। তবে শ্রদ্ধেয় D. G. Apte-র মতে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞান গবেষণার জন্য একটি মানমন্দির ছিল। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের উজ্জ্বলতম পুরুষ মহর্ষি আর্যভট্ট এই মানমন্দিরে গ্রহ-নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করতেন।

যাইহোক মহারাজা সোয়াই জয়সিংহের তৈরি মানমন্দিরগুলো এখনো আমাদের সামনেই রয়েছে।

ইট-চুন-সুরকি দিয়ে তৈরি সবথেকে বিশাল যে যন্ত্রটি মহারাজা জয়সিংহ জয়পুর মানমন্দিরে তৈরি করেছিলেন সেটির নাম সম্রাট যন্ত্র। বারাণসী, দিল্লী, জয়পুর ও উজ্জয়িনী এই চারটি মানমন্দিরেই সম্রাটযন্ত্র আছে তবে এই যন্ত্রের আকার সব মানমন্দিরে একরকম হলেও এদের মাত্রাগুলি সমান নয় অর্থাৎ দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-উচ্চতায় এগুলির মধ্যে পার্থক্য আছে। সবথেকে বড়টি আছে জয়পুরে আর সবথেকে ছোটটি আছে বারাণসীতে।

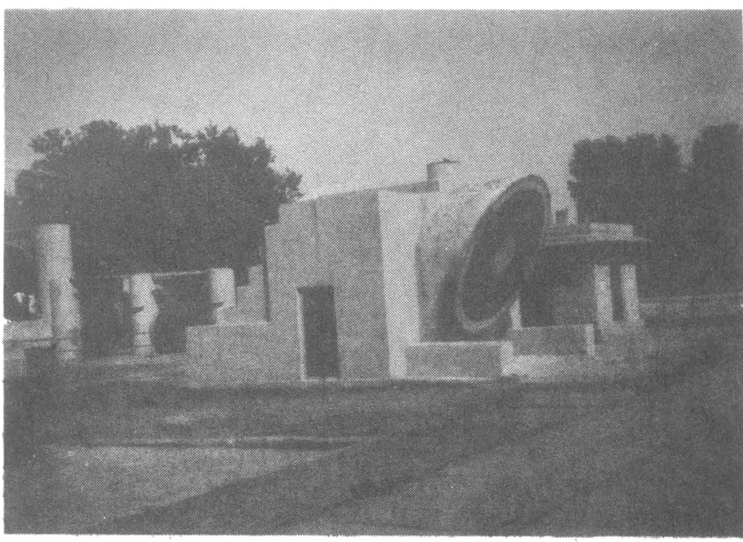

সম্রাটযন্ত্র একটি নিরক্ষবৃত্তীয় সূর্যঘড়ি বিশেষ। এর সমকোনী শঙ্কুর অতিভুজ পৃথিবীর অক্ষের সমান্তরাল এবং শঙ্কুর দুপাশে বৃত্তের পাদ (Quadrant) আছে যা নিরক্ষীয় তলের সঙ্গে সমান্তরাল প্রত্যেক পাদের প্রান্ত ডিগ্রি মিনিট ও সেকেণ্ডে ভাগ করা। মহারাজা জয়সিংহের সময়ে এগুলি ঘটি ও পল এ ভাগ করা ছিল। (১ পল = ২৪ সেকেণ্ড। ১ ঘটি = ৬০ পল = ২৪ মিনিট)।

প্রথম ছবিতে দেখতে পাচ্ছো ছোট সম্রাট

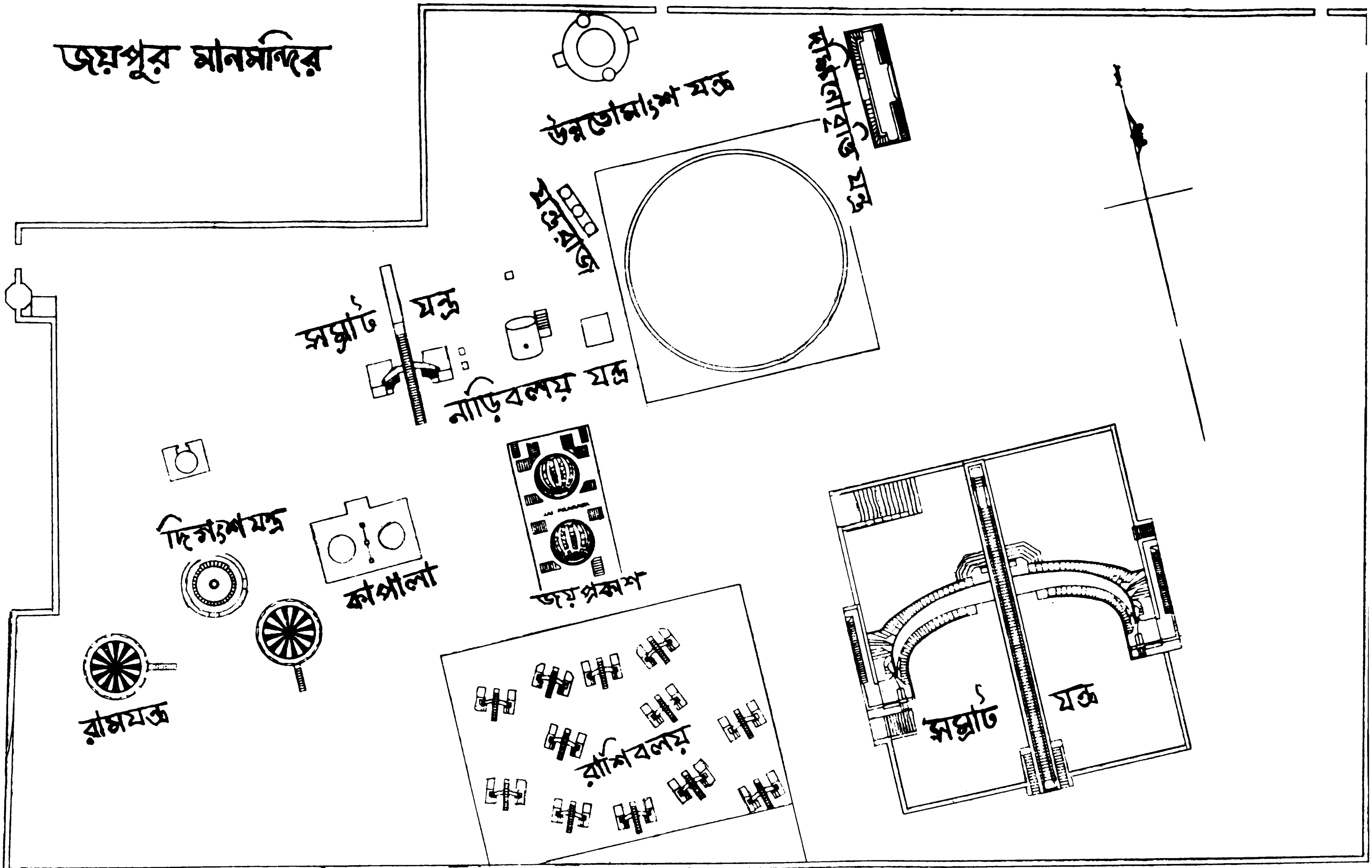

জয়পুর মানমন্দিরের নক্সা

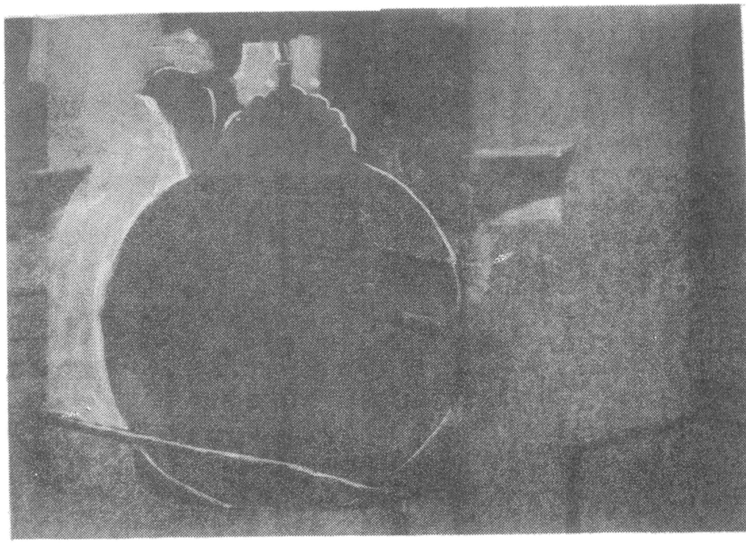

যন্ত্রটি। সমকোণী অতিভুজ যার উপর ছোট-ছোট সিঁড়ি রয়েছে এই অতিভুজটি পৃথিবীর অক্ষরেখার সঙ্গে সমান্তরাল। শঙ্কুর দুদিকে বৃত্তের পাদ যা নিরক্ষীয় তলের সঙ্গে সমান্তরাল তাও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছো সিঁড়ির বাঁদিকে।

দ্বিতীয় ছবিতে সামনে বাঁদিকে দেখা যাচ্ছে রামযন্ত্র। ডানদিকে ছোট-ছোট সম্রাট যন্ত্রের মত দেখতে যে যন্ত্রগুলি রয়েছে ওগুলির নাম রাশিবলয় যন্ত্র। তার পিছনে বিশাল উঁচু যে শঙ্কুটি দেখা যাচ্ছে ওটির উচ্চতা ৭৫ ফুট ৩ ইঞ্চি। এটিই সর্ববৃহৎ সম্রাটযন্ত্রের শংকু।

তৃতীয় ছবিতে দেখা যাচ্ছে নাড়িবলয় যন্ত্রের দক্ষিণভাগ। উত্তরভাগ এরই পিছনদিকটা এবং দেখতে একই রকম। দূরে বাঁদিকে দেখা যাচ্ছে দুটো ধাতুর তৈরী যন্ত্ররাজ বা এ্যাস্ট্রোল্যাব ঝুলছে।

আর চতুথ ছবিতে তৃতীয় ছবিরই যন্ত্ররাজ দুটির একটিকে কাছ থেকে দেখা যাচ্ছে।

এসব মানমন্দিরগুলো দেখে ভালভাবে সবকিছু বুঝতে যথেষ্ট সময় ও ভাল গাইডের প্রয়োজন। কিন্তু বেড়াতে গিয়ে বহু জিনিসের আকর্ষণে সময়ে টান পড়ে আর ভাল শিক্ষিত গাইডও সব সময় পাওয়া যায় না। আমি এবার যে গাইডটিকে পেয়েছিলাম সে দর্শকদের সবকিছুই পেশাদারী দক্ষতায় বুঝিয়ে দিল; কিন্তু আমি যখন তাকে ষষ্ঠাংশ যন্ত্রদুটি দেখাবার কথা বললাম তখন সে কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল ওরকম যন্ত্র জয়পুরে নেই। তাই পনের বছর আগেকার গাইড আমাকে যে ষষ্ঠাংশ যন্ত্র দেখিয়েছিল এবার আর সে যন্ত্রটি নতুন করে দেখতে পেলাম না।

তোমরা যারা এই মানমন্দিরটি আগেই দেখেছো তারা আর একবার এই বিস্ময়কর মানমন্দির ও তার স্রষ্টার কথা মনে করবে আর যারা এখনো দেখোনি আশা করি তারা নিশ্চয় এটি চাক্ষুষ দেখার জন্য কৌতূহলী হয়ে উঠবে।

॥ শেষ ॥

দেবপ্রসাদ মিত্র

এবার জন্মদিনে

"ধন্যবাদ, তোমাদের সবাইকে"

আমার জন্মদিন—

বিকেলে ওরা সবাই এল। সবাই বলতে শুভ্র, সুমন, বুবাই আর আমার ছোট বোন রিংকির বন্ধুরা টুম্পা, দোলা, লালি, টুম্পার দিদি তুলি, এই এরা। আমার স্কুলের বন্ধু বাবুয়ার আসার কথা ছিল, ও এসে পৌঁছয়নি তখনো। অবশ্য বাবুয়া অনেক দূরে থাকে, দেরী হতেই পারে।

আমার জন্যে কেউ এনেছিল গল্পের বই, কেউ বা মনোহরা সন্দেশের বাক্স, কে যেন একটা আশ্চর্য সুন্দর বুদ্ধমূর্তিও এনেছিল। আমার খুব ভাল লাগছিল। ছোট্ট নোট বইটাতে, মার কাছ থেকে পাওয়া সুন্দর ডট পেনটা দিয়ে লিখলাম 'ধন্যবাদ, তোমাদের সবাইকে।' ওদের দেখালাম লেখাটা। ওরা খুব হাসছিল। নিজেদের মধ্যে গল্পটল্পও করছিল নিশ্চয়।

সেই দুপুর শেষ না হতেই মা আমাকে মুখটুখ মুছিয়ে, নতুন জামাপ্যাণ্ট পরিয়ে চুল আঁচড়ে দিয়েছিলেন। মঙ্গল কাকু রং-বেরঙের বেলুন এনে ঝুলিয়েছিল ছাদের সিলিংয়ের হুকে, চারদিকের দেওয়ালের পেরেকে। ফলে পড়ার ঘরের চেহারাটাই গিয়েছিল বদলে; দারুণ একটা খেলা-ঘরের মত হয়ে উঠেছিল সেটা।

মা বলছিলেন সুন্দর দাদু নাকি আসবেন। উনি মার ছোটকাকু, মিলিটারিতে কাজ করতেন, বাংলার বাইরেই ছিলেন বরাবর। তাঁকে আমি আগে দেখিনি, মার কাছে অনেক ছবি দেখে-ছিলাম তাঁর,—উরি ব্বাস্‌রে কি লম্বা-চওড়া চেহারা সুন্দর দাদুর, আর সে চেহারার সঙ্গে মানিয়ে ইয়াব্বড় গোঁফ!

দোলা, টুম্পা, রিংকিরা ফিসফিস করে নিজে-দের মধ্যে কি সব বলাবলি করছিল আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। ওরা সকলে বাড়ির ভেতর থেকে রিনিপিসীর হারমোনিয়ামটা ধরাধরি করে এনে রাখল। রিনিপিসী তার হারমোনিয়াম-টাকে ভারি যত্নআত্তি করে, ঝকঝকে তকতকে জিনিসটায় কাউকে হাত পর্যন্ত দিতে দেয় না। কিন্তু রিংকি জানে আজ রিনিপিসী কাউকেই কিছু বলবে না। হয়ত কেউ গানটান গাইবে। সকলে তুলির খুব প্রশংসা করে, ও নাকি খুব ভাল গান গাইতে পারে।

গান অবশ্য আমি খুব ভাল একটা বুঝতে পারি না। মার সঙ্গে সিনেমায় ছোটদের ছবি দু'একটা দেখেছি, তাতে কখনো কেউ গান গায়, কথাগুলো ঠিকঠাক বুঝতে পারি না সব সময়। পরে হয়ত গল্পটা মা বলে দেন, গানের কথাটথাও। তখন ভাল লাগে।

তুলি হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান শুরু করল। আমার পাশেই শুভ্র বসে ছিল, ও আমার নোট বইতে গানের প্রথম লাইনটা লিখে দিল— 'তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে—'।

শুভ্র খুব তাড়াতাড়ি লিখতে পারে, ওর হাতের লেখাটাও মুক্তোর মত ঝকঝকে। তাছাড়া লেখা-পড়া ও স্বভাবে, দুয়েতেই ভীষণ ভাল শুভ্র, ওর ইচ্ছে আমাকে সাহায্য করা, যাতে আমার কোন অসুবিধা না হয়।

তুলির গান শেষ হওয়ামাত্র সিঁড়িতে দুমদাম পায়ের শব্দ শোনা গেল, ঝড়ের মত ঘরে ঢুকল বাবুয়া, ওর মার হাত ধরে প্রায় টানতে টানতেই। বাবুয়া উত্তেজিতভাবে দেয়াল ঘড়িটা দেখিয়ে দুটো আঙুল তুলে ধরল, তারপর হাত উঁচু করে শরীর বেঁকিয়ে ভিড় বাসে ঝুলন্ত মানুষদের অবস্থা বোঝাল। দোলা, টুম্পারা অবাক হয়ে দেখছিল ওকে। আমি বুঝলাম বেলা দুটো থেকে বাসের জন্য অপেক্ষা করে বাবুয়া ভিড় বাসে অতি কষ্টে কোনক্রমে এসে পৌঁছেচে। ও বেশ হাঁপাচ্ছিল, শুভ্র ওকে শান্ত করে আমার পাশে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিল। বাবুয়ার মা আমাকে দিলেন চমৎকার একটা খেলনা মোটর গাড়ী। আমি ওনাকে প্রণাম করলাম। মা এসে ওঁকে ভেতরে নিয়ে গেলেন।

সবশেষে প্রায় সন্ধ্যের সময় এসে পৌঁছল আমার মামাতো দাদা প্রবাল। অন্য সময় ওকে আমার খুব একটা ভাল লাগে না, সব সময় ওর কেমন যেন একটা অহংকারী ভাব, ক্লাসে ফার্স্ট

হয় ও, তার ওপর ব্যাডমিন্টনেও চ্যাম্পিয়ন! আজ অবশ্য সবাইকেই ভাল লাগছিল আমার।

কিন্তু প্রবালদার সঙ্গে উনি কে! প্রথমটায় আমি ঠিক বুঝতে পারিনি, তবে চিনতে দেরী হল না আমার ছবিতে দেখা মানুষটিকে। গরদের পাঞ্জাবি আর জরিপাড় ধুতি পরা গাট্টাগোট্টা চেহারা, বড় গোঁফ, মাথাভরা পাকা চুল আর ভারি কোমল দুটি চোখওলা মানুষটিকে মা প্রণাম করলেন। ঠোঁটের নড়াচড়া দেখে মার কথা আমি সব বুঝতে পারি, মা বললেন 'উঃ কতকাল পরে যে তোমাকে দেখলাম ছোটকাকু!'

হ্যাঁ, উনিই আমার সুন্দর দাদু।

আমি সুন্দর দাদুকে প্রণাম করলাম। উনি আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। উপহারে আমার টেবিল ভরে উঠল। শুভ্র সব জিনিসপত্তর ঠিক-ঠাক গুছিয়ে রাখল।

হঠাৎ রিংকি আমার হাফ-ইয়ালি পরীক্ষার রিপোর্টটা এনে প্রবালদাকে সেটা দেখিয়ে কিসব বলতে শুরু করল। হাফ-ইয়ালি পরীক্ষায় আমি থার্ড হয়েছিলাম, রিংকি সে কথা খুব আনন্দ আর গর্বের সঙ্গে বন্ধুদের শুনিয়েছিল। আজ আমার ভয়ানক লজ্জা হল। ইস রিংকিটা যেন কি! সুন্দর দাদু হাসিমুখে হাত বাড়িয়ে রিপোর্টটা নিয়ে দেখতে লাগলেন, প্রবালদা যেন কিছু বলল। শুভ্র তক্ষুনি আমার নোটবইতে কিসব লিখেই তা আবার কেটে দিচ্ছিল, আমি তাড়াতাড়ি নোট বইটা কেড়ে নিয়ে দেখলাম শুভ্র লিখেছে 'আজকাল দেখছি কালা-বোবারাও লেখাপড়ায় ভাল হয়ে যাচ্ছে—' কথাটা প্রবালদার। বড় কষ্ট হল আমার। এই ভাল দিনটায়ও চোখ জ্বালা করে উঠল। শুভ্রর মুখটা কেমন করুণ হয়ে গেল, দেখে মনে হচ্ছিল যেন দোষটা সব ওরই। শুভ্রর মত বন্ধু আর উপহারভরা টেবিলের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমি সব দুঃখ ভোলার চেষ্টা করলাম।

একটু পরেই দেখলাম সুন্দর দাদু প্রবালদাকে কি যেন খুব বকাবকি করছেন, মনে হল উনি খুব রাগ করেছেন। প্রবালদা মাথা নিচু করে সব শুনল তারপর আমার কাছে এসে দু হাতে আমার ডান হাত ধরল, অনেকক্ষণ কোন কথা বলল না। শুভ্র উঠে তার চেয়ারে প্রবালদাকে বসতে দিল।

সুন্দর দাদু বিরাট একটা কেক এনেছিলেন। উনি আমার হাতে একটা ছুরি দিয়ে আমার হাত ধরে কেকটাকে কেটে ভাগ করে দিলেন সবার মধ্যে। প্রবালদা তার ভাগ থেকে বড় একটা টুকরো জোর করে আমাকে খাইয়ে দিল। গান শুরু হল আবার। প্রথমে সকলে মিলে, তারপর কেউবা একা একা গান গাইছিল। শুভ্র আমাকে সব গানের প্রথম লাইনটা লিখে দেখাচ্ছিল। চেনা, অচেনা সবগান—ছড়ার গান, অতুলপ্রসাদের গান, রবীন্দ্রসংগীত এমন কি হাসির গানও।

তার পরেই কি অবাক কাণ্ড, সুন্দর দাদুও গান গাইতে আরম্ভ করলেন। গান গাইতে গাইতে সুন্দর দাদু আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন। সকলেরই ঠোঁট নড়ছিল, প্রবালদারও, কেউ কেউ হাততালি দিয়ে তাল দিচ্ছিল। বাবুয়াও হাসি-মুখে হাততালি দিচ্ছিল।

শুভ্র নোট বইতে গানের শুরুটা লিখল 'জন্মদিন, শুভ জন্মদিন · ' আমার খুব ভাল লাগল, কিন্তু ভীষণ একটা যন্ত্রণাও অনুভব করলাম। মা তখন সবাইকে ডাকলেন এবার খাওয়াদাওয়ার পালা,

আমি নোট বইতে লিখলাম—'আমার খুব ইচ্ছে করছে...'

মা সামনেই ছিলেন, আমার লেখা পড়ে বলল, 'বল সোনা, তোমার কি ইচ্ছে করছে' আমি আর কি বলব, হাত জোড় করে নমস্কার করলাম সকলকে। মা বললেন, 'ছোট কাকু, তুমি খোকনকে আশীর্বাদ কর' সুন্দর দাদু আমার মাথায় হাত রাখলেন। আশীর্বাদ করলেন। শুভ্র লিখল 'তোমার সব বাধাবিপাত্তি দূর হোক, তুমি মানুষের মত মানুষ হও।'

চারিদিকে উজ্জ্বল হাসিখুশি মুখ দেখতে দেখতে আমি আমার নোট বইতে লিখলাম

'আমার খুব ইচ্ছে করছে আজ সকলের সঙ্গে গলা মিলিয়ে আমিও গান গাই।'

আমার সেই লেখা দেখে মা যেন চমকে উঠলেন। খুব দুঃখী মানুষের মত লাগল মাকে। মা আমার কাছে এসে আস্তে আস্তে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। মা হয়ত তখন কিছু বলছিলেন আমি বুঝতে পারিনি, আমি মাথা নিচু করেছিলাম, মার মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম না, তবু সেই সময়টাকে আমার সবচাইতে বেশী ভাল লাগছিল।

চোর আর মামদো

অমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায়

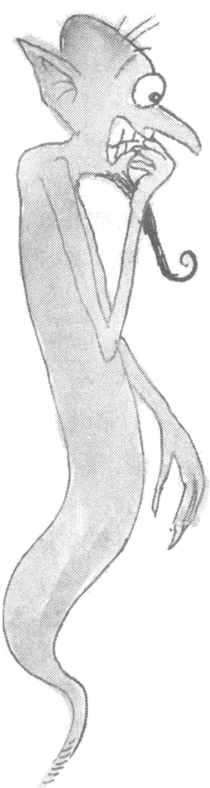

ঘুটঘুটে আঁধারেতে খুটখাট পায়েতে
মুখ ঢেকে চলে কে রে কম্বল গায়েতে ?
নামজাদা চোর বাঘা সিঁধকাঠি হাতেতে
কোথা যায় চুপিসাড়ে নিঝঝুম রাতেতে ?
ক্রমে-ক্রমে চলে আসে গ্রামখানা ছাড়িয়ে
থুত্থুড়ে বুড়ো বট যেখানেতে দাঁড়িয়ে।
হঠাৎ বিপদ একি পড়ে গেল নজরে
গাছ থেকে নেমে আসে মাথা নেড়ে সজোরে
বিশাল মামদো ভূত দাড়িখানা নাড়িয়ে
বলে আজ খাসা দিন, খাবো তোকে তারিয়ে।
বাঘা বলে, আরে ছি-ছি কোরোনা এ কর্ম
খেলে পরে জাত যাবে, সাথে যাবে ধর্ম,
চোর খেলে নির্ঘাৎ জানো এর ফল কি
ভূতেদের সমাজেতে যাবে হুঁকো-কল্কি,
খাতির পাবে না ফিরে জেনো তা অবশ্যি
ভালো করে ভাবো নিয়ে এক টিপ নস্যি।
শুনে ভূত খাবি খায় ছুটে যায় দম বা
পালা-পালা বেঁচে গেলি বলে দ্যায় লম্বা।

পড়াশুনোর গালগল্প

প্রদীপ পারেখ

শিবুদা ঠিক করে দিল, মেয়েটাকে অঙ্ক শেখাতে হবে। কলি অর্থাৎ ইন্দ্রাণী খুব শান্ত ও মনোযোগী। কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই ওর চোখ খারাপ। একটা চোখে একেবারেই দেখতে পায়না, অন্য চোখের পাওয়ার মাইনাস তেরো। টেব্‌ল্ ল্যাম্পে ষাট ওয়াটের বাল্ব লাগিয়ে পড়তে বসে। ডাক্তারের নির্দেশে পড়াশুনো খুবই সীমিত রাখতে হয়েছে, কোন রকমে মাধ্যমিকটা পাশ করে গেলে ও সঙ্গীতচর্চা নিয়েই থাকবে। অসম্ভব ভাল গান গায়।

কলিদের বাড়িতে আমার আদর-যত্নের অন্ত ছিল না। বাড়ির নিচেই মিষ্টির দোকান, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গরম রসগোল্লা তৈরী হচ্ছে দেখতে পেতাম। ওপরে একটু পরে সেগুলোই আবার প্লেটে করে আসত। শিবুদার কল্যাণে আরও দু-এক জায়গায় টিউশানি করেছি, সে সব বাড়ির তুলনায় এদের অবস্থাই সবচেয়ে দরিদ্র। কলির বাবা নেই, দিদিরা টিউশানি করেই সংসার চালায়। মাইনে পেতাম এখানেই সব চাইতে কম। আর যত্ন ও আন্তরিকতা, এখানেই সবচেয়ে বেশি। পড়ানো তো যা হত তা হত, বেশী সময়টাই কাটত ওখানে গল্প করে আর গান শুনে।

ওর বড়দি বাণী একদিন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, জ্যোতি পারেখ তোমার কেউ হয় ?'

'কেন, জ্যোতি তো আমার ছোট ভাই, ও কি করল আবার ?'

'ও, তুমি জ্যোতি পারেখের দাদা ? ওকে নিয়ে আমাদের স্টাফ্‌রুমে এখনও গল্প হয়।'

জানা গেল, বাণীদি মিত্র স্কুলের মর্ণিং সেক্‌শানে নিচু ক্লাসে পড়ান। জ্যোতি ওঁর কাছে স্কুলে পড়েছে। একবার নাকি অদ্ভুত একটা রচনা লিখেছিল, তাই ওর কথা খুব মনে আছে ওঁদের।

জ্যোতি তখন প্রায়ই ভুগত, স্কুলে কামাই হত। এই রকম একবার ক'দিন কামাইয়ের পর স্কুলে গেছে, গিয়ে দেখে রচনা লিখতে দিয়েছে, 'রবীন্দ্রনাথ'। তার আগে নাকি মোটামুটি বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল, জ্যোতি তখনও আসেনি। তাতে কি এসে যায় ? ও আগে গরু রচনা তো লিখেছে। আরম্ভ করে দিল ঃ

আকৃতি—রবীন্দ্রনাথের দুইটি হাত, দুইটি পা, কান ও চোখ, একটি নাক ও লম্বা দাড়ি আছে।

প্রকৃতি—রবীন্দ্রনাথ ভাবুক প্রকৃতির ছিলেন।

খাদ্য—সাধারণ বাঙালীদের মত ভাত ও মাছের ঝোল খাইতেন।

উপকারিতা—রবীন্দ্রনাথ অনেক কবিতা ও রবীন্দ্রসঙ্গীত লিখিয়াছেন, তাহা আমরা পড়ি ও শুনি।

অপকারিতা—রবীন্দ্রনাথের বিশেষ কোন অপকারিতা নাই।

আট বছরের ছেলেটার রবীন্দ্রনাথ রচনার শেষ লাইনটার জন্যই ওকে ওঁরা কেউ ভুলতে পারেননি।

বাঃ, জ্যোতি এমন লিখেছিল ? জানতাম না তো! এর পর শুরু হল আরও সব বিচিত্র গল্প। ফুলিদি-বুলিদি'র পড়ানোর নানারকম মজার মজার অভিজ্ঞতার কথা।

ক্লাস টু'র একটি মেয়ে একবার বিপরীত শব্দ লিখেছিল এভাবে ঃ 'সাদা-দাসা, শুভ-ভশু, ভারী-রীভা', ইত্যাদি।

'সে কি বুলিদি,' নম্বর দাওনি একটুও ? ও বুদ্ধি করে উল্টো করাটা তো ঠিকভাবেই করেছিল !'

দশম শ্রেণীর এক ছাত্রীকে ইংরিজি রচনা লিখতে বলা হয়েছিল, 'My House'। রচনার মধ্যে একটা বাক্য ছিল 'There is also a Tagore-room in our house'। কী ব্যাপার,

Tagore room ? প্রশ্ন করে জানা গেল বাড়িতে ঠাকুর-ঘর আছে যে, সেটাই লিখেছে।

এসব গল্প আমি করতাম বন্ধু-বান্ধবদের কাছে। তখন কলেজে পড়ি, সুপ্রিয় ছিল আমার সহপাঠী। ওর বাবা ইতিহাসের অধ্যাপক। সুপ্রিয় এগুলো শুনে বলল 'এগুলো মজার ঠিকই, কিন্তু বাবা পরীক্ষার খাতায় একবার যা পেয়েছিলেন সেটা না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত।'

বি, এ. পরীক্ষার্থী খাতায় বিশেষ কিছু লিখতে না পেরে নাকি একটা বাঘের ছবি এঁকেছিল। তলায় লেখা, 'আমাকে পাশ না করাইলে এই বাঘ আপনাকে খাইয়া লইবে।'

সত্যি, বিশ্বাস করা কঠিনই বটে।

শর্মিলা স্মৃতি পুরস্কার

প্রায় এগার বছর হয়ে গেল সন্দেশের ৯২০ নং গ্রাহিকা শর্মিলা মুখোপাধ্যায় ১৬ বছর বয়সে আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। নানা বিষয়ে উৎসাহ ছিল তার, পড়াশুনা, বিজ্ঞানচর্চা, নাচগান, বাজনা, খেলাধুলা, ছবি আঁকা, ইংরাজী ও বাংলা লেখা সব কিছুই সে ভালবাসত আর খুব ভাল পারত। নাচ-গান, খেলাধুলা, ছবি আঁকা সব বিষয়ে প্রাইজ পেত। স্কুলে সে পড়াশোনায় প্রথম হত, অন্যান্য বিষয়েও।

শর্মিলার বাবা মা তার স্মৃতিরক্ষার জন্য প্রত্যেক বছর সন্দেশের গ্রাহক গ্রাহিকাদের ১০০.০০ পুরস্কার দিচ্ছেন। প্রত্যেক বছরের শেষে পরের বছরের প্রতিযোগিতার বিষয় ঘোষণা করা হয়। ১৩৯৬ সালের প্রতিযোগিতার বিষয় হল, উপেন্দ্রকিশোর'। তাঁর বিষয় ৩০০ থেকে ৪০০ শব্দের মধ্যে লিখে পাঠাও।

নিয়মাবলী

১। সতের বছরের কম বয়স্ক সব গ্রাহকই যোগ দিতে পারবে।

২। গ্রাহক স্কুল, ক্লাব, লাইব্রেরির ছাত্র, মেম্বাররাও ব্যক্তিগতভাবে যোগ দিতে পারবে।

৩। নাম, ঠিকানা, বয়স ও গ্রাহক নম্বর স্পষ্ট করে লিখবে।

৪। যারা গ্রাহক নয় তারাও ১৫ই জুনের মধ্যে গ্রাহক হলে যোগ দিতে পারবে।

৬। ক-বিভাগে—যাদের বয়স ১২র কম—৫০,০০
খ-বিভাগে—বয়স ১২ বা তার বেশি কিন্তু ১৭র কম—৫০,০০
দরকার হলে পুরস্কারগুলি ভাগাভাগি করে দেওয়া হবে।

৩০শে জুনের মধ্যে উত্তর আমাদের হাতে পৌঁছান চাই।

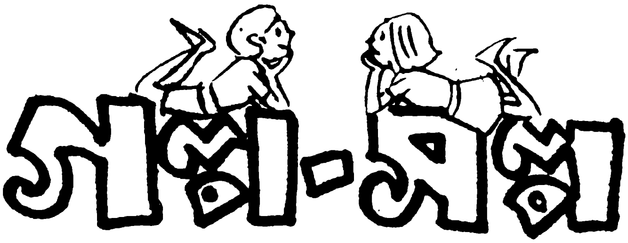

লীলা মজুমদার

একটা বছর শেষ হবামাত্র আরেকটা শুরু হয়ে যায়। মধ্যিখানে দম নেবার জন্যেও কোনো ফাঁকফোকর থাকে না। কখনো ১৪ই এপ্রিল, আবার কখনো বা ১৫ই; এমনকি আবছায়া মনে পড়ছে একবার বোধ হয় ১৬ই ও হয়েছিল। তা সে যে-দিনই শুরু হক, পত্র-পত্রিকার আর ব্যবসাদারদের কোনো ছাড়ান—ছোড়ান নেই। পত্রিকাগুলো যেমন-তেমন করেই হক, বেরোবেই। ব্যবসাদাররা দরকার হলে রাত জেগে, গত বছরের শেষ পয়সাটির পর্যন্ত হিসাব মিলিয়ে, অর্থাৎ যা আদায় হল না তা বাকিতে ফেলে, খাতা বন্ধ করবেই। নতুন খাতা তৈরি করে মন্দিরে নিয়ে গিয়ে দেবতার আশীর্বাদও আনবেই। সবাই জানে তিনি হাত উপুড় করেই আছেন।

কিন্তু আমরা সন্দেশীরা কি করব? কোনো শক্ত সঙ্কল্প নেবার কথা মনেও এনো না। জীবন ভরে কম নববর্ষ পার করিনি, কম সঙ্কল্প নিইনি আর শেষ পর্যন্ত তার কি দুর্গতি হয়, তাও কম দেখিনি। নববর্ষ করার আরেকটা উপায়-ও আছে। সে হল বাইরে কিছু না বলে, নিজের মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করা। কাজটাকে যত সহজ ভাবছ, তত সহজ নয়। ছয় মাস পার হবার অনেক আগেই নিজের উপর রাগে ঘেন্নায় সর্বাঙ্গ জ্বলে যাবে; দুঃখে অনুতাপে বুক ফেটে যাবে। আমি ভুক্তভোগী, আমার কথা শোন। হয়তো ভাবছ, ইনি এত আমি—আমি করছেন কেন? তার একমাত্র কারণ তোমাদের বিষয়ে এ-সব কথা বললে, আমার উপর আরো ঢের বেশি চটে যেতে।

জন্ম থেকেই শুরু করছি; কিন্তু ১০ বছরের বেশি হিসাব দিতে আমার লজ্জা করছে আর তার যথেষ্ট কারণও আছে। শোন তবে! মায়ের দুধ ছেড়ে অবধি আমি দুধের ওপর হাড়ে চটা ছিলাম। তা কে শোনে? কি আর বলব, বাধ্য হয়ে রোজ নিদেন এক লিটার দুধ খেয়েছি।

তার মানে, বাদসাধ দিয়েও বছরে ৩৫০ লিটার দুধ গিলতে বাধ্য হয়েছি। ১০ বছরে খেয়েছি ৩৫০০ লিটার। প্রায় রোজ একটা করে ডিম খেয়েছি; অর্থাৎ ১০ বছরে অন্ততঃ ৩৫০০ ডিম খেয়েছি মাছ খেয়েছি ছোট বেলায় ১ টুকরো করে রোজ; তার মানে ৩৫০০ টুকরো। অর্থাৎ কিলোতে ২০ টুকরো উঠলে, ১৭৫ কিঃ মাছ। রোজ চার স্লাইস রুটি, অর্থাৎ ১০ বছরে অন্ততঃ ১২০০০ স্লাইস।

ফল পাকুড়ের কথা যদি বল, থাকতাম শিলং পাহাড়ে; সেটা ফলের দেশ ছিল। বছরের ১০০ দিন মতো রোজ চারটে কমলা, অর্থাৎ ১০ বছরে ৪০০০ কমলা; রোজ ৪টা ন্যাসপাতি = ৪০০০; প্রায় সারা বছর রোজ ১টা কলা অর্থাৎ কম করে ৩০০ কলা বছরে আর ১০ বছরে ৩০০০ কলা। চাঁপা কলাও নয়, বিশাল সব মর্তমান।

এ সবের উপর ভাত ডাল তরকারি লুচি পরটা মোহনভোগ মণ্ডামিঠাই দই পায়েস ইত্যাদি! আজকাল তো আমার ঘোরতর সন্দেহ হয় যে ঐ দেশজোড়া খাদ্যাভাব, তার গোড়াপত্তন বোধহয় আমার আর আমার মতো আরো পাঁচজনের হাতেই হয়েছে। তা সে থাক গে, ঐ সব খেয়েদেয়ে শরীরটাকে এমনি তাগড়া বানিয়েছি যে আজ পর্যন্ত আমার সন্দেশী বন্ধুদের কাছে লম্বা লম্বা বোল ঝাড়তে পারছি। তোমরাও যখন যা ভালো জিনিস পাবে, সব খেয়ে, কাজ করে শরীরটাকে খু—ব কর্মঠ বানিয়ে দুনিয়া জয় কর।

ভালোবাসা নিও।

সমস্ত গ্রাহক-গ্রাহিকা

তোমরা আজকাল সবাই একই কথা লিখছ, তাই একসঙ্গে চিঠির উত্তর দিচ্ছি—

যারা ডাকে বই নাও

অনেকেই লিখেছ যে ডাকে বই হারাচ্ছে!

প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথমে Under Certificate of Posting তোমাদের বই পাঠানো হয়।

তৃতীয় সপ্তাহেও না পেলে তারপর ডুপ্লিকেট চেও।

সেই চিঠি এবং ডুপ্লিকেট বইও মাঝে মাঝে হারায়!

কলকাতার গ্রাহকেরা সম্ভব হলে হাতে হাতে ডুপ্লিকেট কপি নিয়ে যেও।

যাদের বই হারাচ্ছে তারা সবাই Supt. of Post Offices-এর কাছে নালিশ জানাও। তাতে হারানো বই অবশ্য ফেরত পাবেনা, তবে ভবিষ্যতে হারানো হয়তো কমতে পারে।

সন্দেশ ১৩৯৬

১৩৯৫ তো শেষ হতে চলল। নতুন বছরের চাঁদা পাঠিয়েছ কি? না হলে তাড়াতাড়ি পাঠাও। নতুন চাঁদার হার খেয়াল রেখো।

বছরটাত শেষ হতে চলল—তোমরা সবাই বলেছ যে নতুন বছরে সন্দেশ আরো সুন্দর হক, রঙিন হক। আমরাও নানাভাবে চেষ্টা করছি সন্দেশকে আরো ভাল করতে ভাল ভাল লেখা দিতে, অনেক ছবি দিতে। কিন্তু রঙিন করতে হলে আরো অ-নে-ক অ-নে-ক গ্রাহক চাই, তার জন্যে তোমাদের সাহায্য চাই।

যারা পারবে, তারা কোমর বেঁধে লেগে পড়, দেখি কে কটি নতুন গ্রাহক সংগ্রহ করতে পার।

প্রতিযোগিতার নিয়মকানুন ভাল করে দেখে নাও। না বুঝতে পারলে জোড়া পোষ্ট কার্ড লিখে আমাদের কাছে জেনে নাও।

মনে রেখো—এই প্রতিযোগিতায় বড়রাও অংশ নিতে পারেন।

গ্রাহক সংগ্রহ প্রতিযোগিতা শুরু হল!

সন্দেশ সংক্রান্ত বিবরণ

১। প্রকাশের স্থান—কলিকাতা

২। মাসিক পত্রিকা

৩। মুদ্রক ও প্রকাশক—শ্রীঅশোকানন্দ দাশ, ভারতীয়, ১৭২/৩, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০২৯।

৪। সম্পাদক—শ্রীমতী লীলা মজুমদার, ভারতীয়, ১১/৪, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেণ্ড লেন, কলিকাতা-৭০০০১৯, শ্রীমতী নলিনী দাশ, ভারতীয়, ১৭২/৩, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০২৯ শ্রীসত্যজিৎ রায়, ভারতীয়, ১/১, বিশপ লেফ্রয় রোড, কলিকাতা-৭০০০২০।

৫। স্বত্বাধিকারী—সুকুমার সাহিত্য সমবায় সমিতি লিমিটেড।

উপরোক্ত বিবরণগুলি যথার্থ এবং সত্য—অশোকানন্দ দাশ—মার্চ, ১৯৮৮।

সারা বছরের ধাঁধা প্রতিযোগিতার ফলাফল

প্রথম পুরস্কার—২০·০০

সারা বছরে একটিমাত্র উত্তরে সামান্য ভুল।

২৭৬৭ শঙ্খ সান্যাল (১৩½)

দ্বিতীয় পুরস্কার—প্রত্যেকে ১০·০০

সারা বছরে একটিমাত্র উত্তর ভুল

৩০০৩ শুভব্রত সেনগুপ্ত (১৩) ৩৩৫১ দেবজ্যোতি মিত্র (১৩)

এ দেরও উত্তর ভাল হয়েছিল

২৪৬ কৃষ্ণ অঞ্জনা, কৃষ্ণ অনন্যা, কৃষ্ণ অর্চনা ও কৃষ্ণ অন্তনা দেব (১১½), ৩১৫৭ নওশাদ ও আসাদ জামিল (১০½) ১৭৭৯ রেশমি দত্ত (৮½) ৫৫৫ সুতপা গাঙ্গুলি (৮) ২৩৭৯ অর্পিতা ও কিংশুক সিংহ (৮) ৬৫৫ ঋতব্রতা দাস (৭½) ১১৬৮ মুনমুন দাশগুপ্ত (৭½) ১৬২৭ সুলগ্না ও অর্পণ ঘটক।

এবারকার ধাঁধা প্রতিযোগিতার ফলাফল কিন্তু মনের মতন হল না! উত্তরদাতাদের সংখ্যা অনেক কম।

যারা উত্তর দিয়েছ, তাদের মধ্যেও অনেকে সব মাসে উত্তর দাওনি—কাজেই নম্বর কম উঠেছে।

কোন ধরণের ধাঁধা তোমাদের বেশি ভাল লাগে জানাও তাহলে সেগুলি আরো বেশি দেব।

ইন্দ্রাণী দাশগুপ্ত স্মৃতি প্রতিযোগিতার ফলাফল

ক-বিভাগ—প্রথম পুরস্কার—২৫·০০

সায়নদীপ পালিত (গ্রাহক নয়)

দ্বিতীয় পুরস্কার—প্রত্যেকে ১৫·০০

১৩৫ মঞ্জরী বাগচী, বসুধা চক্রবর্তী (গ্রাহক নয়)

খ-বিভাগ—প্রথম পুরস্কার—২৫·০০

৩২৪৩ উজ্জয়িনী ভট্টাচার্য

দ্বিতীয় পুরস্কার—প্রত্যেকে ১৫·০০

২৩৭৯ অর্পিতা সিংহ, অয়ন ব্যানার্জি (গ্রাহক নয়)

এদের আকা ছাবও ভাল হয়েছিল

ক-বিভাগ—৮২৬ অনুরূপ মিত্র, পরীক্ষিৎ ব্যানার্জি, দেবযানী চ্যাটার্জি (গ্রাহক নয়)

খ-বিভাগ—৪৬ সাত্যকি গুপ্ত, ১৯৩১ সুচন্দ্রা দাশগুপ্ত, ২২৮২ সুনন্দিতা দাশগুপ্ত, ২৫০২ অপরাজিতা ধাড়া, ২৫৭৮ বিনীতা মুখোপাধ্যায়, ৩৩৫১ দেবজ্যোতি মিত্র।

সবচেয়ে ভাল ছবিগুলি হয় রঙিন, নয় তো পেনসিলে আঁকা, তাই কোন ছবি ছাপা হল না।

১০৯২ পৃষ্ঠার উত্তর

ডাইনে পাগলা দাশুর ছবিতে

(১) উড়ন্ত পাখী কম,
(২) আজব জানোয়ারের বাঁ'কান লম্বা,
(৩) চোখের তারা ওপর দিকে ওঠানো,
(৪) নাকটা কেমন জানি অন্যরকম,
(৫) হাতে তর্জনীতে নখ আছে,
(৬) তর্জনীর দৈর্ঘ বেশী
(৭) আকাশ যানের যন্ত্রে স্যুইচ্ বেশী,
(৮) কন্ট্রোল যন্ত্রে স্ক্রু কম

কালাচাঁদ বলেছিল, এটা কেরে বাবা!
প্রোফেসর উত্তর দিলেন, আমি বলছি ভূত।

প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর

পরিবেশ দূষণ ও সংরক্ষণ
একটি আর্জি

জীবন সর্দার

পরিবেশ সম্পর্কে আজকাল প্রকৃতি-পড়ুয়াদের মত সব পড়ুয়াই সচেতন। 'দূষণ' আর 'সংরক্ষণ' শব্দ দুটির অর্থ আর ব্যবহার খুব চল। ১৯৬০ সালের আগে এত চল ছিল না শব্দ দুটির।

প্রকৃতি-পড়ুয়ারা দেখতে পাচ্ছে, তাদের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, আমাদের দেশটা, বলতে গেলে গোটা বিশ্ব, শিল্পে সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে। সাথে সাথে সুখভোগের জিনিস, যত চাই পাওয়া যাচ্ছে তার পাশে পড়ে থাকছে আবর্জনার স্তুপ। ব্যবহার শেষে, কিংবা ব্যবহারের অযোগ্য—ফেলে দেওয়া জঞ্জালের পাহাড়। মানুষের আর কাজে লাগছে না বলে, ঐ 'পাহাড়' বাড়তে বাড়তে মানুষকেই চেপে ধরতে চাইছে। কারখানার চিমনীর আর যানবাহনের ধোঁয়া বাতাসকে কালো করে দিয়েছে। নদীর জল 'কালো' হয়েছে, শহরের কলকারখানার নর্দমার জলে। আবর্জনার 'পাহাড়' আর 'কালো' জল হাওয়া একদিন 'কালা পাহাড়ের' মত আমাদের সুখের জীবন তছনছ করে দেবে, যদিনা, তার আগে ঠিক ঠিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

এটাত সত্যি যে মানুষই মানুষের পরিবেশ, প্রাকৃতিক পরিবেশ নষ্ট করছে মানুষের কাছেই তাই পরিবেশ সংরক্ষণের আর্জি। আর্জি এই ঃ

আবর্জনার স্তূপ আর জঞ্জালকে সমতল করে, সেখানে ছোট বন তৈরী হোক। সে বনে হোক নিরাপদে বেড়াবার ব্যবস্থা।

ডোবাপুকুর নালা ও নদী সমুদ্রের জল নির্মল হোক। সে জলে মাছ আর প্রাণীরা বেঁচে থাকুক। বেড়ে উঠুক প্রাকৃতিক ভারসাম্যের নিয়ম মেনে।

চাষ আবাদের কাজ, ফসল ফলানো আর রক্ষার কাজ, এমন হোক, যেন, মাটি জল হাওয়া দূষিত না হয় রাসায়নিক কারণে।

আর্জি মঞ্জুর! তবে আর কি চাই। ফুসফুস ভরে পরিষ্কার হাওয়া, আঁজলা ভরে পরিষ্কার জল পেলে অসুস্থ হবে না কেউ। শস্যদানা, সবুজ সবজী আর ফলের গায়ে পোকা মারার বিষ লেগে নেই, ভাবনা গেল। বেড়াবার জন্য শান্ত নির্জন বনে যখন খুশি হাওয়া খাবে। সেখানে পাখির ডাক শুনে, প্রজাপতির ওড়া দেখে আর শিশুদের সাথে খেলায় খেলায় দিন কাটিয়ে ঘরে ফিরতে কে না চাইবে।

পৃথিবীর সবদেশ এমন আর্জি মেনে নিয়েছে। সেই মত কাজও হচ্ছে। এই আর্জি যদি তোমারও আর্জি হয়, যদি তুমি প্রকৃতি-পড়ুয়া হয়ে প্রকৃতিকে জানা চেনায় আগ্রহী হও, তবে আর দেরী না করে সন্দেশে যোগাযোগ কর—চিঠি লিখে বা নিজে এসে।

ফোটো ঃ অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

খুঁজতে খুঁজতে দেখতে পেলাম

জাহাজ ঘাট ছাড়িয়ে, নদীর মাঝে একটা পায়রাকে জলে ভাসতে দেখে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ওটা পায়রা ছিল না। মাঝিরা বলেছিল বটে ওটা জলপায়রা। ডানার পালকের রং আর মাথার রং ছাই ছাই, মানে ধূসর। বাকি সব সাদা দেখতে। জলপায়রা—,না কি, ভাসতে ভাসতে চলে গেল। তখন ছিল শরৎকালের শেষ। তারপর অনেক খুঁজেছি, নদীর ধারে ধারে হেঁটেছি অনেকদূর। অমন পাখির দেখা পাইনি।

শীতের মাঝামাঝি গিয়েছিলাম সাগরের ধারে। ওখানে খাঁড়ির মুখে, জেলে ডিঙির আশে পাশে, ঝাঁক ঝাঁক জলপায়রা ভাসছে দেখে থমকে গেলাম। কিছু বসে ছিল ডাঙ্গায়, বালু তীরে। সেখানে এক ঝাঁক কালো মাথার জল পায়রা দেখলুম। দেখতে সেগুলো ওদের থেকে ছোট। যখন উড়ে গেল, ওদের ডানার ডগায় পালকের রং কালো মনে হলো।

জল পায়রা না বলে, ওদের যদি জলেরচিল বলি, তবে বোধ হয় স্বভাবে মেলে নামটি। যে ভাবে উড়ছে, জল-ঝাঁপিয়ে খাবার ঠোঁটে ধরছে—সব চিলের স্বভাব।

জলের কিনারা ধরে একটা সাদা পাখি উড়ে এলো দূর থেকে। আমি সেদিকেই তাকিয়ে ছিলাম। কাছে আসতেই দেখলুম ওটার লেজ চেরা। জল পায়রার ঝাঁকে না এসে, উড়ে গেল পুব থেকে পশ্চিমে। একবার জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল ডানা মুড়ে। ঠোঁটে কি ধরে সাথে সাথেই উঠে এলো। উড়তে উড়তেই মুখে পুরে দিল সবটা। এটাই যেন আসল 'গাংচিল'—আমার মনে হলো। এই পাখিটার হাবভাব ভাল করে খোঁজ নেব ঠিক করলাম। এ ব্যাপারে প্রকৃতি পড়ুয়াদের সাহায্য চাই।

গাংচিলের হাবভাব ঃ সন্দেশের ঠিকানায়, প্রকৃতি-পড়ুয়ার দপ্তরে, একটি চিঠিতে নিচের খবরগুলো খোঁজ নিয়ে জানাও। সন্দেশের পাঠক, যে কেউ, এই কাজটি করে দিতে পারবে। খোঁজ দেবে ঃ

এক) লেজ চেরা ধূসর সাদা রংয়ের পাখিটিকে কোথায় দেখলে—ঝিল-পুকুরে, নদীর ধারে না সাগর তীরে ?

দুই) পাখিটির পায়ের রং, ঠোঁটের রং, ডানার ও মাথার পালকের রং কেমন ?

তিন) পাখিটির ওড়ার ভঙ্গি কেমন ? (ডানা ঝাপটে উড়ছে না ডানা মেলে দিয়ে বাতাসে চিল শকুনের মত ভাসছে ?)

চার) পাখিটির খাবার খোঁজা, খাবার ধরা আর খাবার খাওয়া লক্ষ্য কর। হুবহু সব বর্ণনা লিখে জানাবে।

[জী. স.]

সমুদ্র পাহাড়ের দেশে ক্রিকেট

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

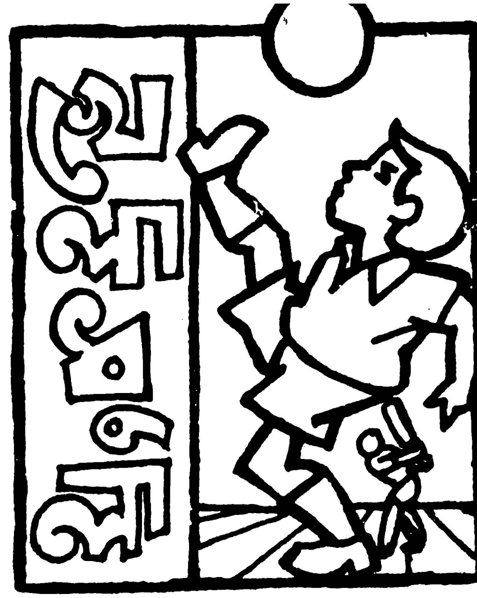

ভারতীয় ক্রিকেট দল এখন ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে খেলছে। সমুদ্র, পাহাড়, নারকেল গাছ আর আখের খেতে ভরা এক একটা দ্বীপ। দ্বীপের মানুষদের গায়ের রং কুচকুচে কালো। এক মাথা কোঁকড়া চুল। গলা ছেড়ে হাঃ হাঃ করে হাসে ওরা। গান গায়। ওদের বেশিরভাগই ভীষণ গরিব। পেট ভরে খেতেও পায় না। ওদের বাড়ির ছেলেরা সারাদিন সমুদ্রের ধারে পড়ে থাকে। কাঠের একটা ডাণ্ডা ওদের ব্যাট। আর ছোট্ট একটা পাথর কিম্বা কাঠের টুকরোর ওপর কাগজ আর ন্যাকড়া জড়িয়ে বানিয়ে নেয় বল। তারপর শুরু হয় খেলা। কখনও সমুদ্রের ধারে নি-ক্রিকেট কখনও ব্যাটবলের লড়াই। খিদে পেলে গাছে উঠে নারকেল পেড়ে নেয়। হাতে হাতে পেয়ে যায় দুখানা রুটি আর মিষ্টি জল। কোন কোন দিন সমুদ্রের মাছ আগুনে ঝলসে খায়।

এই রকম সমুদ্রের ধার থেকে উঠে এসেছেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের নামকরা সব খেলোয়াড়রা। এখনও আসছেন। ভবিষ্যতেও আসবেন। ওদের খেলা বলতে শুধু ক্রিকেটই। যত জোরে পারে ওরা বল করে। যতো জোরে পারে সেই বল মারে। ঐভাবে খেলতে খেলতে কারো চোখে পড়ে যায় কেউ কেউ। তারপর তারাই উঠে এসে একদিন ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটের হাল ধরে। এইভাবেই উঠে এসেছেন স্যার গ্যারি সোবার্সের মতো বিশ্বের শ্রেষ্ঠ অলরাউণ্ডার, ওয়েস হলের মতো দুরন্ত ফাস্ট বোলার, ক্লাইভ লয়েডের মতো

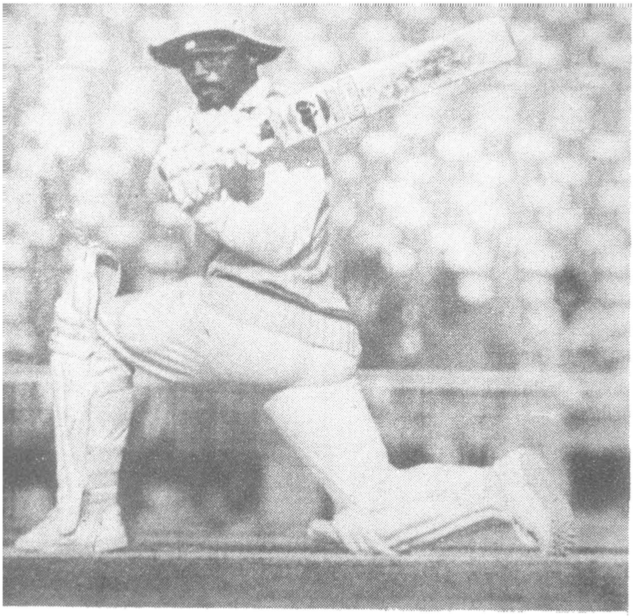

দলনেতা, ভিভ রিচার্ডসের মতো বিশ্বের সেরা ব্যাটসম্যানরা।

সেই দেশেই গিয়ে এখন খেলছেন ভারতীয় খেলোয়াড়রা। এই লেখা ছাপা হয়ে তোমাদের হাতে পৌঁছুবার আগেই শেষ হয়ে যাবে সব কটি আন্তর্জাতিক ম্যাচ। শুরু হয়ে যাবে টেস্টও। ভারতের সঙ্গে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম টেস্ট ম্যাচটি ২৫-৩০ মার্চ পর্যন্ত জর্জ টাউনে হবে। দ্বিতীয় টেস্ট এপ্রিল মাসের ৭ থেকে ১২ তারিখ পর্যন্ত —বার্বাডোজে। তৃতীয় টেস্ট ১৫ থেকে ২০ এপ্রিল ত্রিনিদাদের পোর্ট অফ স্পেনে আর চতুর্থ টেস্টে ম্যাচটি হবে ২৮ এপ্রিল থেকে ৩ মে পর্যন্ত জামাইকার কিংসটনে। এই ম্যাচটি খেলেই ভারতীয় ক্রিকেট দল দেশে ফিরে আসবে।

সে যাই হোক, তোমরা যারা ইডেনে বাংলার সঙ্গে তামিলনাড়ুর রনজি ট্রফির সেমিফাইনাল ম্যাচটির খবর রেখেছো তারা তো জানোই বাংলা এবার কি সুন্দরই না খেলেছে। তাই তো সতেরো বছর পরে বাংলা আবার ফাইনালে উঠতে পেরেছে। বাংলাকে ফাইনালে তুলতে দারুণ খেলেছেন দলনেতা সম্বরণ ব্যানার্জি, ব্যাটসম্যান রাজিন্দর সিং, স্নেহাশিস গাঙ্গুলি আর বোলিংয়ে গৌতম সোম দুর্দান্ত হয়ে উঠেছিলেন। তাই তিনি তামিলনাড়ুর ডব্লিউ রামনের সঙ্গে যুগ্মভাবে ম্যান অফ দ্য ম্যাচের পুরস্কার পেয়েছেন। তবে খেললেন বটে তামিলনাড়ুর ডব্লিউ ভি রামন। তিনি একাই বাংলাকে প্রায় হারিয়ে দিতে চলেছিলেন। রামন ভারতীয় দলে ঢুকবেন ঢুকবেন করছেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ খেলতে যাবার জন্যে অতিরিক্ত তালিকায় তাঁর নামও ছিলো। সিধু যদি ওয়েস্ট ইণ্ডিজ যেতে না পারতেন তা'হলে তিনিই যেতেন। বোর্ড তো তাঁকে তৈরি থাকতেও বলেছিলো। এই মরশুমে রামন দারুণ ফর্মে আছেন। ঘরোয়া ক্রিকেটের প্রত্যেকটা ম্যাচেই তিনি দারুণ খেলছেন। ওঁর খেলা দেখতে দেখতে মনে হয়েছে, ভারতীয় দলের সঙ্গে ওঁকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ পাঠালে ভালোই হতো।

রনজি ট্রফির অন্য সেমিফাইনালে বোম্বাইকে হারিয়ে দিয়েছে দিল্লি। ভারতীয় দল থেকে বাদ পড়া স্পিনার মনিন্দার সিং এই ম্যাচে দারুণ খেলেছেন। সাত সাতটা উইকেট দখল করে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হয়েছেন তিনি। ভালো খেলেছেন

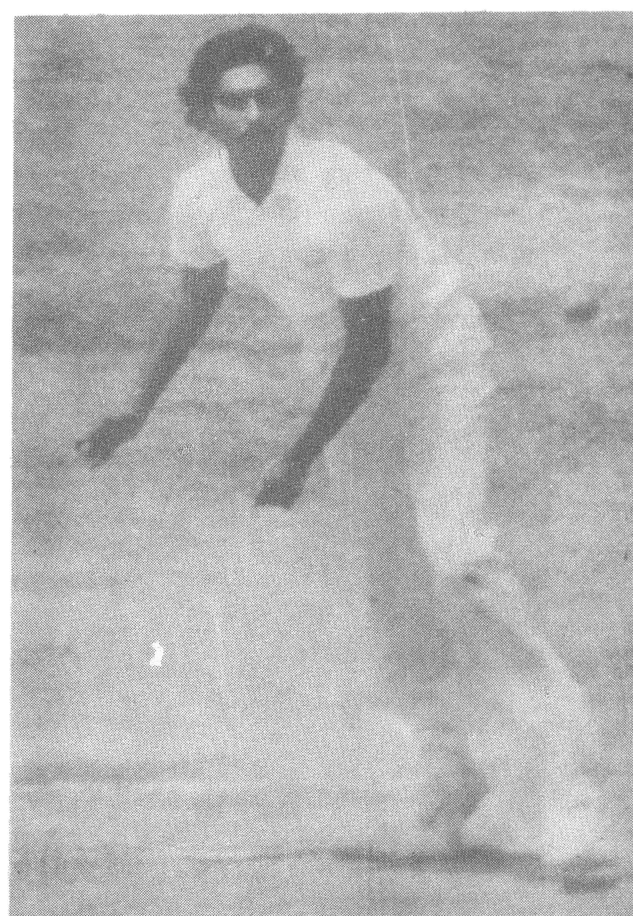

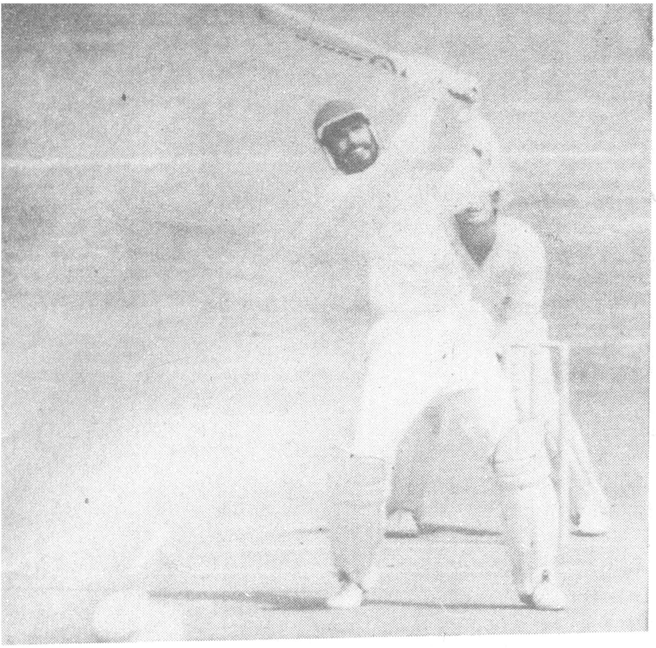
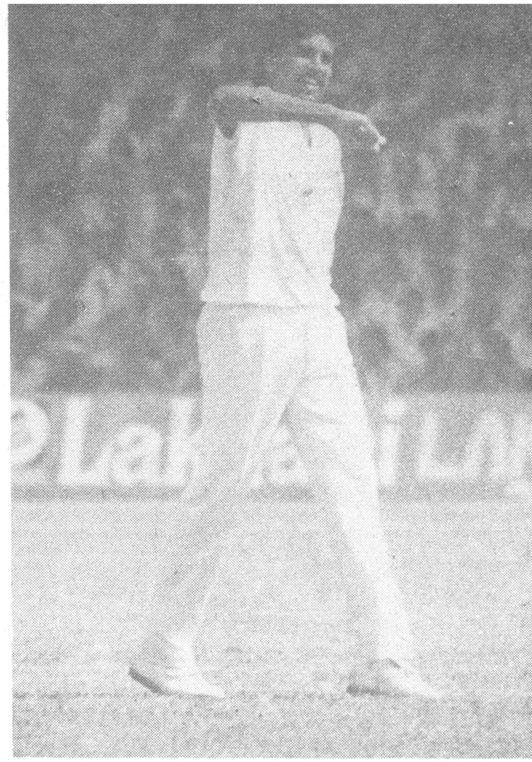
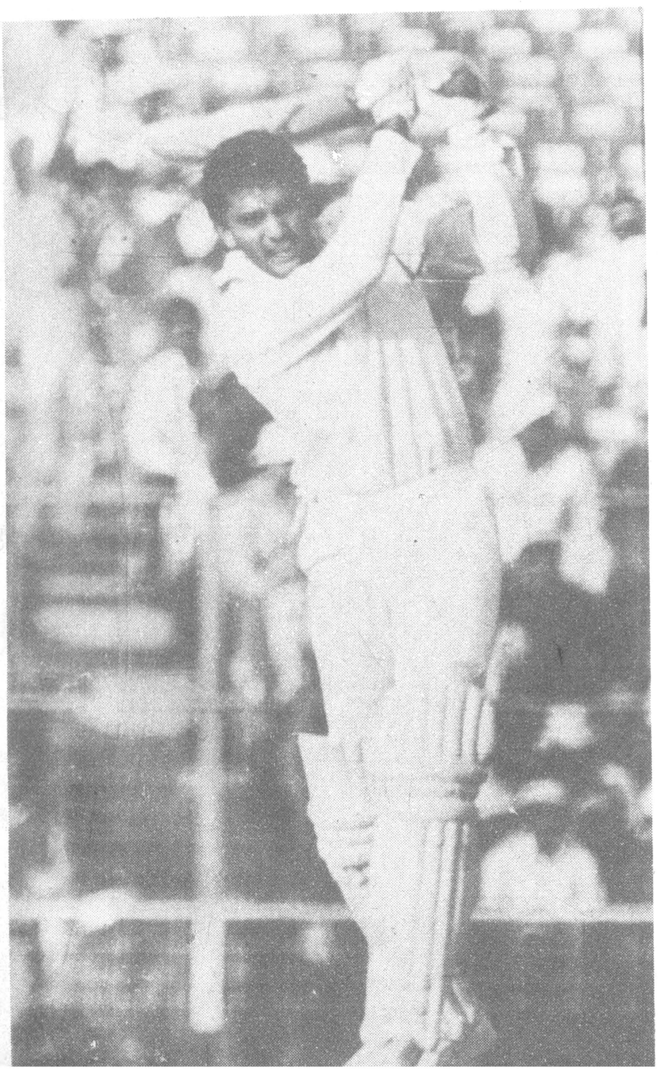
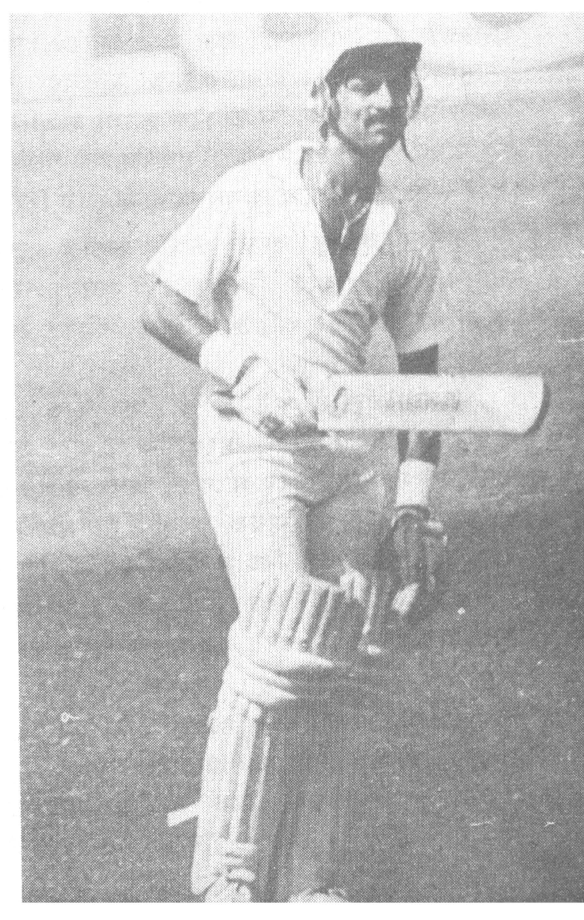

ভারতীয় দল থেকে বাদ পড়া আর এক খেলোয়াড় মনোজ প্রভাকরও। রামনের মতো মনিন্দরও যদি ভারতীয় দলে থাকতেন তাহ'লে ভালো হতো বলে অনেকেই মনে করছেন। বিশেষজ্ঞদের ধারণাও তাই। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে রামন আর মনিন্দর সিংকে দলে নিলে কাদের বদলে নেওয়া হতো ? তবে রামন দলে থাকলে কিন্তু ভালোই হতো। ওঁর বয়েস কম। এই অভিজ্ঞতা ওঁকে পরিণত হতে যথেষ্ট সাহায্য করতো।

অসমে জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতাও তো প্রায় শেষ হয়ে এলো। বাংলা কি এবার তার হারানো সম্মান ফিরে পাবে ? বাংলার কোচ শ্যাম থাপা আর অধিনায়ক অলোক মুখার্জী কিন্তু আশাবাদী। তাঁদের বিশ্বাস বাংলা এবার জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় ভালো খেলবেই। বাংলাকে প্রথমে শিলচরে খেলতে হল, তারপর মূল পর্বে গুয়াহাটিতে। বাংলা দল এবার যথেষ্ট শক্তিশালী করে গড়ে তোলা হয়েছে। অভিজ্ঞ আর নতুন খেলোয়াড়দের নিয়ে গড়া বাংলা দল চ্যাম্পিয়ন হয়ে জাতীয় ফুটবলে আবার আধিপত্য ফিরে পাবার জন্যে চেষ্টা

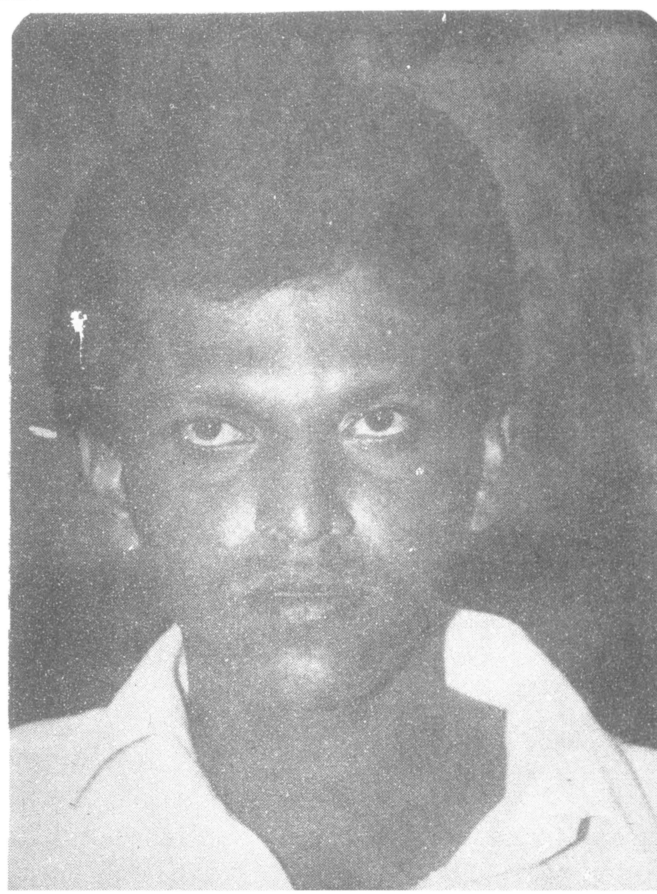

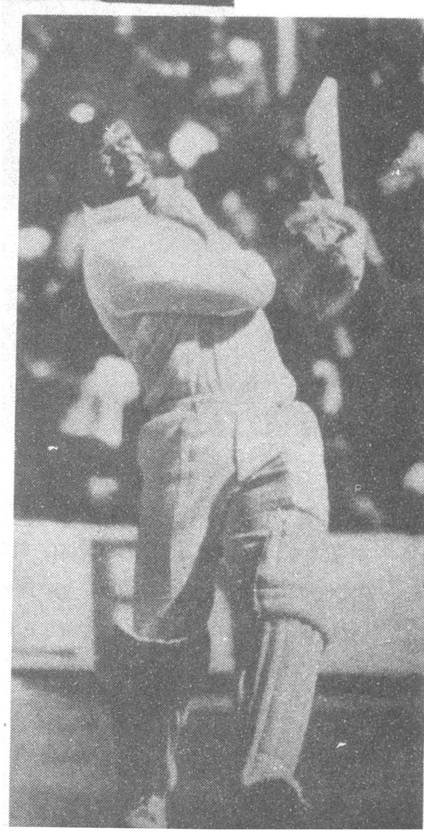

করবে বলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। অসমে যাবার আগে খেলোয়াড়রা সে কথা বলেও গেছেন।

অসমে জাতীয় ফুটবলের পরই হবে কোয়েম্বাটোরে ফেডারেশন কাপের খেলা। সেখান থেকে ফিরতে না ফিরতেই মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল আর মহামেডানকে এস-এস-ট্রফি আর এয়ারলাইন্স ট্রফিতে খেলতে হবে। আর তারপরই আসল লড়াই। শুরু হয়ে যাবে লীগের খেলা। লীগের আর আই, এফ, এ, শীল্ডের দিকে চোখ রেখেই তো কলকাতার দলগুলো তৈরি হয়। শতবছর আই, এফ, এ,—শীল্ডের খেলা তো হলোই না।

তোমরা অনেকেই নিশ্চয়ই টি, ভিতে টাইসনের সঙ্গে ব্রুনোর লড়াই দেখেছো। ব্রুনোকে পাঁচ রাউণ্ডের মাথায় টেকনিক্যাল নক আউট করে টাইসন বিশ্ব হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়নশিপে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের খেতাব বজায় রেখেছেন। প্রথম রাউণ্ডে ইংলণ্ডের যোদ্ধা ব্রুনো কিন্তু দারুণ লড়েছিলেন। ঐ সময় টাইসন একটু যেন কোনঠাসা হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তারপরই তিনি রুখে দাঁড়ান। ঘুঁষিতে ঘুঁষিতে ব্রুনোকে অস্থির করে তোলেন। তবু ব্রুনো কিন্তু পাঁচ রাউণ্ড পর্যন্ত লড়েছিলেন। তারপর ব্রুনোকে বড় আঘাতের হাত থেকে বাঁচাতে বিচারক টাইসনকে বিজয়ী বলে ঘোষণা করেন। তাই বারো রাউণ্ডের লড়াই শেষ হয়ে যায় মাঝামাঝি পর্যন্ত গড়াবার আগেই। স্পিংকস টাইসনের কাছে হার মেনেছিলেন ৯১ সেকেণ্ডের মধ্যে। সেদিক দিয়ে চিন্তা করলে ব্রুনোকে বাহবা দিতেই হবে। টাইসনের মতো মুষ্টিযোদ্ধার বিরুদ্ধে পাঁচ রাউণ্ড পর্যন্ত লড়া বড় সহজ ব্যাপার নয়। তাই হেরে গিয়েও ব্রুনো ইংলণ্ডের জাতীয় হিরোর সম্মান পেয়েছেন। আর জেতার পর মহম্মদ আলির ঢংয়ে টাইসন বলেছেন, আই অ্যাম দ্য গ্রেটেস্ট।

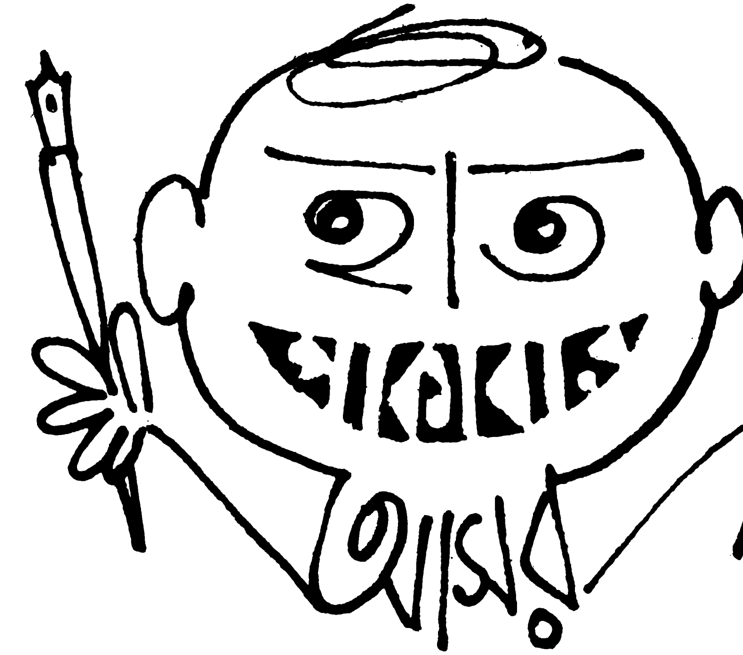

* হাতপাকাবার আসর কেবলমাত্র ১৭ বছরের কম-বয়স্ক গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা আর ছবি ছাপার জন্য।
* সন্দেশের পছন্দমত লেখা আর ছবি ছাপা হয়।
* কাগজের এক পিঠে পরিষ্কার করে লিখবে। নাম, গ্রাহক সংখ্যা ও বয়স দেবে।
* ছবি আঁকবে কেবল কালো কালিতে আর ছোট মাপে—৩" × ৪" চেয়ে বেশি যেন না হয়।

সাতপরী

দেবার্ঘ্য দে ৮১৬ / ৯ বছর ৩ মাস

রাজা ছিলেন, রাজার চার ছেলে দুই রানী ও বাকি সব ছিল। কিন্তু একটাও মেয়ে ছিল না তাই রাজ্যে খুব দুঃখ। শেষে অনেক কাণ্ড করে রানীর মেয়ে হল। রাজকন্যার ভাতে খুব ধুমধাম করে উৎসব হল। রাজ্যের সবাইকে রাজা নিমন্ত্রণ করলেন। এখন হয়েছে কি সেই রাজ্যে সাত পরী থাকতেন। রাজা তাঁদের নিমন্ত্রণ করতে ভুলে গেছেন। পরীরা খুব রেগেছেন। তখন তাঁদের কে সামলায়। তারা এসে রাজার মেয়ে ও ছেলেদের অভিশাপ দিলেন যে তারা এখুনি পাথর হবে। সবাই পরীদের কাছে ক্ষমা চাইল, কিন্তু কোন পরীই শুনলনা। রানী রাজা ও রাজ্যের সবাই কান্নায় ভেঙে পড়লেন। তাই দেখে এক পরীর দয়া হল। তিনি বললেন, সাত সমুদ্র পেরিয়ে যে রাজ্য আছে সেই রাজ্যের মুনি এসে যখন ওই পাথরে গঙ্গাজল ছেটাবে তখন আবার তারা মানুষ হবে। সবার মনে তখন একটু স্বস্তি দেখা দিল।

একদিন নবকুমার নামে এক রাজপুত্র ও এক মুনি সেখান দিয়ে তীর্থে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তাঁরা কয়টা পাথরে হোঁচট খেলেন। মুনি বুঝলেন এগুলো মানুষ পাথর। তখন মুনি তাঁর ঘটের গঙ্গাজল পাথরগুলোতে ছেটালেন, তখন দেখা গেল চার রাজপুত্র ও এক রাজকন্যা। সেই খবর রাজার কানে গেল। অমনি চারদিকে রব উঠল। সেই রাজপুত্র ও রাজকন্যার বিয়ে হল, সবাই আনন্দ করতে লাগল।

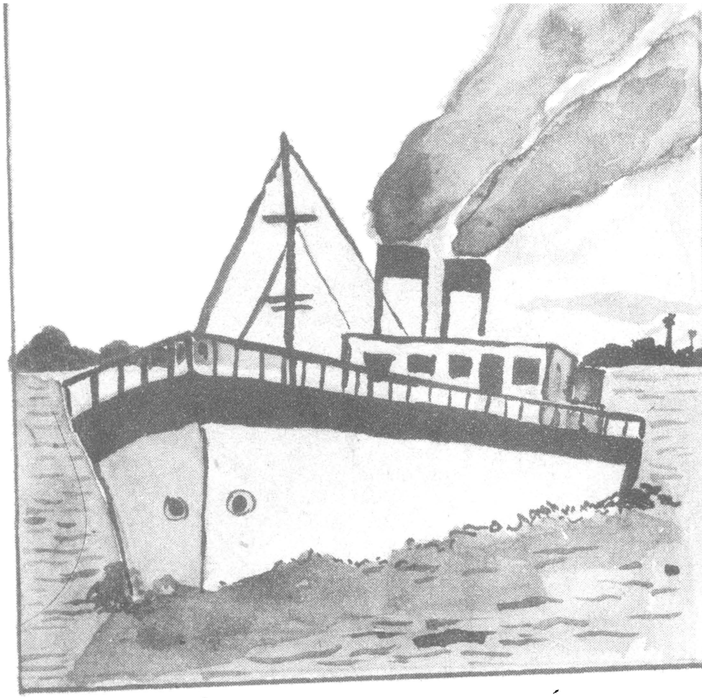

৮৬২ অমিতকুমার বাগচী—১১ বছর

কলকাতা

ঈশা মুখার্জী / ৩২০৭ / ১১ বছর ৫ মাস

বহুদিন পূর্বে ওই ছোট্ট গাঁয়ে
বটের তলায় ছিল মোর ঘর, বাঁয়ে
হাঁদুমুদির দোকান, ডানে ছিল তার
ছিল কাশবন শুধু আর।
বহুজন এসে করে বহু ঘর,
করেছে তোমায় আজ মস্ত শহর,
তুমি আজ অনেকের আশ্রয়দাতা,
তবু আমি ভুলিনি তোমায়, হে বন্ধু, কলকাতা।

গ্রীষ্মকাল

কৌশিক সিংহ

৮৪০ / ১০ বছর ৫ মাস

গ্রীষ্মকালে
রৌদ্র কিরণে
মাটি যায় ফেটে।
জল যায় শুকিয়ে
আকাশ থাকে
মেঘ-মুক্ত।
প্রচণ্ড রৌদ্র কিরণে
পৃথিবী যায় ঝিমিয়ে।
কিন্তু গাছ যায় ভরে
আম, জাম, কাঁঠাল,
শশা ও তরমুজে।
সন্ধ্যের দিকে
আকাশ কালো করে
দেখা দেয়
ভয়ঙ্কর কালবৈশাখী
ঝড়ের বেগে
ভেঙে পড়ে ঘরবাড়ি।

দাদাভাই

অন্তরা ব্যানার্জী / ৭০৮ / ১১ বছর ৩ মাস

আমার যে দাদাভাই
শুধু করে খাই খাই।
যদি দেখে বিস্কুট
খায় সে কুট কুট।
মিটসেফে মা রাখে পাটালি ও চিনি, গুড়
দাদাভাই তার পাশে করে শুধু ঘুর ঘুর।
বাবা আনে সন্দেশ, ছানার পোলাও
দাদাভাই বলে শুধু আমাকে দাও।
এই মত দিন রাত খোঁজে সে খাবার
মা বলে 'বাবা গো, পারি নে কো আর।'

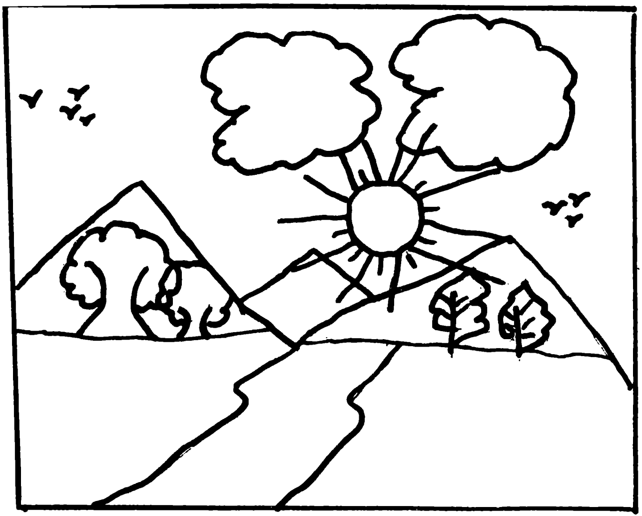

পারমিতা সরকার ৬০৪ / ৭ বছর

দিদার কলম

মনসিজ গাঙ্গুলী / ৭১৭ / ৯ বছর

৫ বছরের টুবুর ফাউনটেন পেন নিয়ে গবেষণা করার ইচ্ছে ছিল।

একবার তার দিদা ৫০ টাকা দিয়ে বিদেশী পেন কিনলেন। টুবু হাতে চাঁদ পেল। একদিন সে দেখল যে তার দিদা চান করতে গেছে।

প্রথমে সে ফাউনটেনটার গায়ে, গায়ে মাখার তেল দিল, আর এসেন্স। আর যে কি করল তা ওই জানে।

দিদা কিন্তু সব জানতে পেরেছিলেন তাই নকল পেন রেখেছিলেন।

গার্গী ধর—৯১/ ৮ বছর

ভ্রম

রিয়া দত্ত / ৬৮০ / ৯ বছর

রোজকার মতন রাতের খাবার খেয়েদেয়ে আমি আর দাদাভাই শুয়ে পড়েছিলাম। আমার পাশেই অন্য একটা খাটে দাদাভাই শোয়। আমি পড়ি ক্লাস ফোরে, দাদাভাই পড়ে ক্লাস টুয়েলভে।

শীতের রাত, বেশ ঘুমোচ্ছিলাম। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল—দেখি টিমটিমে নীল আলোটা জ্বলছে। আর একটা লম্বা মতন কে যেন ঘরের মধ্যে পায়চারি করছে। দাদাভাইটা লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। আচ্ছা ঘুম যা হোক ! একটু পরে সেই লোকটা দাদাভাইয়ের পড়ার টেবিলের ড্রয়ারটা খুলল। ঝনর ঝনর···হাল্কা আওয়াজ পেলাম, —এইরে। বোধহয় জ্যামিতির বাক্সটা পেয়েছে—ওতে যে দাদাভাই পরশু জন্মদিনে পাওয়া বড় নোটগুলোও রেখেছে খুচরো পয়সার সঙ্গে। এবার আমার ভীষণ ভয় হল। গলা শুকনো, তবু জোরে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'চোর চোর !!'

হন্তদন্ত হয়ে ওঘর থেকে মা বাবা ছুটে এলেন। মা টিউব লাইটটা জ্বালাতেই চোখ ছানাবড়া ! মা বাবা হাসতে শুরু করলেন। কেন জানো ? আসলে 'ওই লোকটা হল দাদাভাই। ঘুম না আসায় পায়চারি করতে করতে পড়া মুখস্থ করছিল—সামনে পরীক্ষা তাই।

পাশবালিস ও দলা পাকানো লেপকে আমি দাদাভাই শুয়ে আছে ভেবেছিলাম। হাসতে হাসতে দাদাভাই বলল, 'আমি কিনা নোট খাতা খুঁজছি, টেবল ল্যাম্পটা জ্বেলে পড়ব বলে, তুই আমাকে চোর বানিয়ে ছাড়লি ?'···কি বোকাই মনে হল নিজেকে।

ভূতের মুখে রাম নাম

অনির্বান মিত্র / ৩৩৭৫ / ১৪ বছর

হাঁফাতে হাঁফাতে ঘরে ঢুকলো হীরুদা। আমি আর বোঁচা শারদীয়া সন্দেশ পড়ছিলাম। দুজনেই চমকে তাকিয়ে দেখলাম হীরুদাকে। হীরুদা ঘেমে-নেয়ে অস্থির, যেন এইমাত্র কোত্থেকে দৌড়ে এল। হীরুদাকে এই মুহূর্তে ঠিক অলিম্পিকের সোনা বিজয়ী দৌড় চ্যাম্পিয়নের মত মনে হচ্ছিল।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—"কী হয়েছে হীরুদা?" হীরুদা ধপ করে চেয়ারে বসে বলল—"সব বলছি, আগে এক গ্লাস জল খাওয়া।" বোঁচা উঠে গিয়ে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল এনে দিল। এক চুমুকে সেটাকে শেষ করে একটু ধাতস্থ হয়ে হীরুদা যা বলল তা একটি প্রাণঘাতী শব্দ, বিশেষ করে এই ভয় সন্ধ্যেবেলায় তো বটেই।

"ভূত'—বলল হীরুদা।

"ভূত? কোথায়?" বলে উঠলাম আমি আর বোঁচা একসাথেই। হীরুদা বলল—"এইমাত্র দেখে এলাম। ওই যে রায়বাগানের কাছে বাঁশবন, সেখানেই।" হীরুদা এইমাত্র ভূত দেখে আসছে? আমি আর বোঁচা জিজ্ঞেস করাতে হীরুদা বলতে শুরু করল—"রাস্তাটা তো চিনিস-ই! অন্ধকার, দুধারে মাঠ। এই সন্ধ্যাবেলায় ভাবলুম কেন আর দেরী করি? শর্টকার্টে বাঁশবনের ভেতর দিয়ে আসছিলাম। ওমা একটু এগিয়ে গিয়ে শুনি কে যেন নাকী সুরে বনের ভেতর থেকে টেনে টেনে গাইছে—

"হঁরে কৃঁষ্ণ হঁরে কৃঁষ্ণ, কৃঁষ্ণ কৃঁষ্ণ হঁরে হঁরে,
হঁরে রাঁম হঁরে রাঁম-অ, রাঁম রাঁম হঁরে হঁরে-এ।"

ভূতের মুখে রামনাম? হতেই পারে না—অসম্ভব! রাস্তা ছেড়ে তাই ঢুকে পড়লুম ডানদিকের বাঁশবনে। বেশ খানিকটা এগিয়ে গেলাম। যত এগুচ্ছি ততই নাকী সুরের আওয়াজ বেড়ে যাচ্ছে। তারপর কি হলো জানিস?' বলে থামলো হীরুদা।

"কি?" আমাদের দুজনের সোৎসাহে প্রশ্ন।

"দেখি কি একটা জায়গায় বেশ বড় চাঁদোয়া খাটান হয়েছে আর হ্যালোজেন বাতি জ্বলছে। আর বলব কি, শুনলে বিশ্বাস করবিনে, দেখি কি যে সেই চাঁদোয়ার তলায় একটা মঞ্চের ওপর আলখাল্লা পরা এক সন্ন্যাসী ভূত ঐভাবে গলা ছেড়ে গান ধরেছে, তার চারপাশে দুচারজন, চেলাচামুণ্ডা ভূত। আর সামনে? বোধহয় পঞ্চাশটা ভূত গদগদ হয়ে কীর্তন শুনছে। আমি যেই একটু নড়াচড়া করেছি অমনি শুকনো পাতার ওপর আমার পায়ের খসখস শব্দ শুনে সেই সন্ন্যাসী ভূত গান থামিয়ে পিছন ফিরে চেঁচিয়ে উঠলে—"কেঁ? কেঁ ওঁখানে?' আর অমনি হইহই রব উঠল। আর আমি? সোজা দৌড়ে তোদের বাড়ি।" চুপ করলো হীরুদা।

বোঁচা বলল—"কি যা-তা বকছো! ভূতেরা রাম-নাম করছে হ্যালোজেন জ্বেলে! এও বিশ্বাস করতে হবে?" হীরুদা বলল—"মডার্ন ভূত, বুঝলি না। সাইন্স, আর্টস সবদিক দিয়ে ওরাও তো উন্নতি করছে কিনা।"

"ধুর! যতসব গাঁজাগল্প বলছো তুমি।" বললাম আমি, রেগে গিয়ে হীরুদা বলল—"বিশ্বাস করা না করাটা তোদের ব্যাপা—" কথা শেষ হল না। এবার হাঁফাতে হাঁফাতে ঘরে ঢুকলো পটলা। বল্লে—"জানিস আজ কি হয়েছে!"

"কি হয়েছে?" আমার বোঁচার ও হীরুদার

প্রশ্ন। পট্‌লা বললো—"তোদের বললুম না এবারে রায়বাগানের ওখানে ভোলাবাবাজী এসে রয়েছেন। সাক্ষাৎ দেবতা লোক। আমি আজ তার ওখানে কীর্ত্তন শুনতে গেসলাম। কি হলো জানিস? বাবা সবে কীর্ত্তন ধরেছেন এমন সময় কে একটা লোক, বোধহয় চোর-ছ্যাঁচড় হবে চুপটি করে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। বাবার প্রণামীর বাক্স হাতাবার ধান্ধায় ছিল বোধহয়। বাবা অন্তর্যামী। গান থামিয়ে পিছন ফিরে বললেন—"কেরে? কে ওখানে?" ব্যাস্! ব্যাটা দে দৌড়। আজ বাবা সেখানেই শেষ করে দিলেন। কি কাণ্ড বলতো! সাধু-সন্ন্যেসির কাছেও চোর?"

আমি আর বোঁচা হীরুদার দিকে চেয়ে দেখলাম। হীরুদার তখন সে এক বিকট অবস্থা। উঠে দাঁড়িয়ে বলল—"ইয়ে-মানে-বুঝলি-মানে-দেরী হয়ে যাচ্ছে-চললুম-হ্যাঁ?"

এই বলে আর না দাঁড়িয়ে দরজা খুলে যে গতিতে এসেছিল সে গতিতেই বেরিয়ে গেল।

ভুতুয়া বিদ্রোহ

ত্রিদিব কুমার খাঁড়া
৭৭৬ / ১০ বছর

হঠাৎ গাছে উঠল শব্দ
হো-হো-হো হো-হো হো,
জিগেস করতে বলল সবাই
ভূতুয়া বিদ্রোহ।
ব্যাপার স্যাপার দেখতে গেছি
দোলের আবির মেখে,
ফটাস করে হাড়ের চাঁটি
পড়ল এসে টাকে।
দুষ্টু ভূতের হাড়ের লাথি
পড়ল এসে ঠ্যাঙে,
ভোরের বেলা চেঁচিয়ে উঠে
ঘুমটা গেল ভেঙে।

সোভিয়েত দেশ থেকে প্রকাশিত
ছোটদের জন্য মনমাতানো বই, পত্রপত্রিকা,
পোস্টেজ স্ট্যাম্প-এর অন্যতম বৃহত্তম পরিবেশক—
ভস্তক
(হাউস অফ্ সোভিয়েত বুকস্ এ্যাণ্ড পিরিওডিক্যালস্)
এ-সি ২১০ সল্ট লেক, কলিকাতা-৭০০ ০৬৪
৭ ক্যামাক স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০১৭
৭১ মহাত্মা গান্ধী রোড. কলিকাতা-৭০০ ০০৯
সেন্ট্রাল রোড, শিলচর, অসম
যশবন্ত রোড, পানবাজার, গুয়াহাটী, অসম
সোভিয়েত পত্রিকার গ্রাহক হয়ে মস্কোতে
মুদ্রিত ক্যালেণ্ডার উপহার নিন।

তন্তুশ্রী

বাংলার সেরা তাঁতের কাপড়
বালুচরী, টাঙ্গাইল,
শান্তিপুরী, পলিকট শাড়ী
এ ছাড়াও
তাঁত ও ছাপা
বেডসীট ও বেড কভার
রং—বেরঙের কম্বল
ওয়েস্ট বেংগল হ্যান্ডলুম এন্ড
পাওয়ারলুম ডেভেলপমেন্ট
কর্পোরেশন লিঃ
(পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের সংস্থা)
৬-এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার
(৭ম তল) কলিকাতা-৭০০০১৩

তোমাদের প্রিয় বন্ধু

দস্যি ছেলেটা তোমাদের
সাধের খেলনা—রেলগাড়ি
ভেঙে তার চাকা নিয়ে
উধাও হচ্ছে। এই
দস্যিপনা কি সহ্য করা যায়?
সত্যিকারের রেলগাড়িও তো
তোমাদের বন্ধু।

দূরদূরান্তে যেখানেই যাও,
এই রেলগাড়িই তো তোমাদের
সেখানে পৌঁছে দেয়।
দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের
ভবিষ্যতও তো এই
রেলগাড়ির ওপর
নির্ভরশীল।

যে সমস্ত
দুষ্টু লোক
এই রেলগাড়ির
সাজ-সরঞ্জাম চুরি
ও তার চলাচল
অচল করে আমাদের
অসুবিধে করছে,
ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষতি
করছে, দেশের
ভবিষ্যৎ নষ্ট করছে,
তোমরা বড় হয়ে
তাদের ক্ষমা
কোরো না।

তোমাদের বন্ধুর শত্রু
তোমাদেরও শত্রু।

পূর্ব রেলওয়ে

অষ্টবিংশতিতম বার্ষিক সূচীপত্র

মে ১৯৮৮—এপ্রিল ১৯৮৯

বৈশাখ…চৈত্র ১৩৯৫

অগস্ত্য / উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ৬৬৭
অদ্ভুতুড়ে / মুস্তাফা নাশাদ ৫১৬
অপমানের শোধ / উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ১০৫৬
অবদান / রীতা রায় ২৬২
অবনীন্দ্রনাথের ছবি আঁকা / অরুণকুমার সেনগুপ্ত ৮২
অবাধ্য হরিণছানা / উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ৯৮৩
অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি / মঞ্জিল সেন ৭৭
অভিনব আইডিয়া / ভবানীপ্রসাদ মজুমদার ২৫৫
অভিযান / রেবন্ত গোস্বামী ১০২৬
অমরনাথ / হাসি ঘোষ ৫০৩
আঁকবো ছবি / গৌতম অধিকারী ১৭৯
আঁকিয়ে / দেবাশিস বসু ৪৬৬
আগুন রাঙা দিনগুলি / করুণাময় বসু ৮৫৭
আজও একশো পঁচিশে / গৌতম অধিকারী ৯১
আজগুবিয়াস / ভবানীপ্রসাদ মজুমদার ৭৪
আবিষ্কার / মঞ্জিল সেন ৪৩৪
আমাদের গ্রামে থাকে / সুবীর গুপ্ত ১৫৬
আমাদের ছুটি / উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ৪৮৪
আমার ছুটি / প্রণব মুখোপাধ্যায় ৪০৩
আমার জন্মদিন / দেবপ্রসাদ মিত্র ১১০২
আমার দাদামশাই / কল্যাণী কার্লেকর ২২
আমার ময়ূর / প্রিয়ংবদা দেবী ১১২
আর ভয় পায় না / সুবীর গুপ্ত ৯১৫
আলোর রথ / তপনকুমার চৌধুরী ৪৭৮
আশ্চর্য গোলক / সত্যজিৎ রায় ৬৯
আষাঢ়ে সন্ধ্যায় / রেবন্ত গোস্বামী ৭০৬
ইডলিডোসা / নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ৩৯০
ইন্দ্রাণী দাশগুপ্ত স্মৃতি প্রতিযোগিতা ৬৪৯
ইরমিকির / মহাশ্বেতা দেবী ২১৯
ইলশেগুঁড়ি / সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ২৭৫
ইষ্টকুটুম / সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ৪০৪
উড়তে শেখা / দীপ্তি দাশগুপ্ত ৪৭৯
উপেন্দ্রকিশোর / সুমিতা সামন্ত ৪১০
উপেন্দ্রকিশোরের সন্দেশ / সত্যজিৎ রায় ৩০
উনিশ ধাপের দিন / সলিল চট্টোপাধ্যায় ১০৬২
এক গুচ্ছ ছড়া / প্রীতিভূষণ চাকী ৯৮৬
একটু ভুলে / করুণাময় বসু ৪৮৩
একাল-সেকাল / নিখিল তরফদার ১০০৭
এখন শুধু ক্রিকেট / শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ৮০৫
এলো কোন মেলে / চুনী দাশ ৯৩৪
ক-এর কাণ্ড প্রতিযোগিতা ৬৫৩
কণিয়া / সলিল চট্টোপাধ্যায় ৮৭৫
কথাবার্তা / উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ৩৪.১১৪, ১৯৬, ৩৩৯, ৬২৪, ৭২৯, ৭৪৭, ৭৬৫, ৯২১
কমলা নাপিত / উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ৮৩৯
কলতান / তাপস রায়চৌধুরী ৭১৪
কাঁইরে নানা / তাপস রায়চৌধুরী ৪০২
কাছিম / বিশ্বপ্রিয় ৭২২
কাটাকুটি / তাপস রায়চৌধুরী ৯১৫
কাকু ও লক্ষ্মী / শৈবাল চক্রবর্তী ৮৮১
কার্টুন / অমল ৪৩৩, ৬৭৩
কার্টুন / সুফি ৫৫৯, ৫৭৩
কাল সারারাত / প্রণব মুখোপাধ্যায় ৩০৩
কালাচাঁদ বনাম পাগলা দাশু ৯০, ১৭৮, ২৫০, ৩৩৯, ৬২৪, ৭২৯, ৮০১, ৮৭৪, ৯৪৮, ১০৩০, ১০৯২
কালো / সমীরকুমার সামন্ত ৭৫১
কাসীমের আংটি / উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ৬৬৪
কি আর তফাৎ / সুনীতি মুখোপাধ্যায় ১০৯৬
কিশোর রাজা / জ্যোতিরিন্দ্র গুহঠাকুরতা ৪১০
কুম্ভকর্ণের প্রতিদ্বন্দ্বী / সলিল লাহিড়ী ৯২
কোলাহল / সুস্মিতা সামন্ত ১০১৫
ক্যালগারিতে শীত অলিম্পিক / ঋষিন হালদার ৯৫৩
ক্যালেণ্ডার এল কেমন করে / সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় ৮০
ক্ষতি কিছু না হোক / নিখিল তরফদার ৮৯৫
খুকুমণি / উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ১১
খেপু বেড়ালের গল্প / জ্যোতির্ময় মজুমদার ৪৬৮

খেলাধুলার কথা / শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৪০, ৭২৩, ১০৩৯, ১১১৩

খেলুড়ে মহাবীর / গঙ্কেশ বিশ্বাস ৯৯৮

খোকন সোনার রেলগাড়ি / চুনী দাশ ৪৩২

খোকাবাবুর সার্কাস / কালিদাস রায় ১৯৯

খ্যাতির বিড়ম্বনা / প্রসাদ দাস মুখোপাধ্যায় ৪২৪

গঙ্গা আনিবার কথা / উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ৭৪৪

গণৎকার তারিণী খুড়ো / সত্যজিৎ রায় ২১২

গণেশ / উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ৯৭৯

গণেশের কাণ্ড / সুরজিৎ দাশগুপ্ত ৮৬৪

গতিতত্ত্ব / অভিজিৎ সেনগুপ্ত ৭৭৪

গরু মারার জঙ্গলে / বন্দনা সান্যাল ৮৩

গল্পসল্প / লীলা মজুমদার ২০, ১৮১, ৩২৮, ১০৩১, ১১০৮

গান / উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ২১১, ৩৭১

গুপ্তা সাহেবের গুপ্তধন / নলিনী দাশ ৫৮৬

গুরু আমার / ভবানীপ্রসাদ মজুমদার ১২৯

গোল / শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৩৩

গ্রীষ্মের গান / উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ১১১

গ্রে ফ্রায়ার্স ববি / অরুণকুমার দত্ত ১০৬৮

ঘুড়ি আবিষ্কার / রূপক চট্টরাজ ৫৮৪

চড়াই / প্রণব মুখোপাধ্যায় ১৪০

চাকরের চিন্তা / পলাশ বরন পাল ৬১৭

চাঁদা বনাম জ্ঞান / সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় ৯০৬

চাষীর বুদ্ধি / চঞ্চলকুমার ঘোষ ১০৪৪

চিঠিপত্র ১৬০, ৩৩৬, ৭১৭, ৮০২, ৯৪৯, ১০৩৪, ১১০৯

চিল মা / উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ১৯৪

চোর আর মামদো / অমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায় ১১০৫

চোর ধরা / সুধীন্দ্র সরকার ৫১১

ছড়া / বাসুদেব ভট্টাচার্য ৪৫৫

ছড়া / রথীন্দ্রনাথ রায় ৫৭০

ছড়া / কবিতা মুখোপাধ্যায় ১০২৭

ছড়ার মাসী / সুনীতি মুখোপাধ্যায় ১০৩৩

ছানা / অজেয় রায় ৪৭৩

ছুটি / আদিনাথ নাগ ৫৭১

ছেলেবেলা / করুণাময় বসু ৬৮

ছোট বৌ / উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ২০০

জয়পুরের মানমন্দির / নিরঞ্জন সিংহ ১০৯৭

জাতীয় বিজ্ঞান দিবস ও চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমণ / অনিশা দত্ত ১০২৯

জানোয়ারের বন্ধুতা / উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ১০৮২

জাপানী দেবতা / উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ২০৩

জীবরাজ্যের আজব খবর / উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ৫১৪

জুজুর ভয়ে / বিশ্বপ্রিয় ৫৬৩

জেমস / তাপসকুমার ১০৮৬

জোয়ান লোকের কথা / উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ৯৭৬

জোলা আর সাত ভূত / উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ১১৯

জ্ঞানী / সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ৪১৯

ঝিকর গাছার ঘুঘু শিকারী / সুখেন্দু দত্ত ৩০০

ঝুড়ি-অলা / গৌরী ধর্মপাল ৪৯৯

টুনটুনি আর রাজার আরো গল্প প্রতিযোগিতা ১০৩

টুপুর কথা / আশিসকুমার মুখোপাধ্যায় ৮২৩

টুসি / শিশির বিশ্বাস ৫১৭

টোটোর অ্যাডভেঞ্চার / গল্প—নলিনী দাশ, ছবি প্রশান্ত ১৪৮, ২২৮, ৩০৮, ৭০৪, ৭৬৬, ৮৬২, ৯১৬, ১০০৮, ১০৭৮

ঠার / উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ৭৬৩

ঠিকানা / প্রণব মুখোপাধ্যায় ৫১

ঠিকে ভুল / প্রসাদদাস মুখোপাধ্যায় ৭১৩

ঠ্যাঙাড়ে / সঞ্জয় গঙ্গোপাধ্যায় ৪৬০

ডাকে সোঁদর বন / প্রসাদ দাস মুখোপাধ্যায় ৮৯

ডাঃ দানিয়েলির আবিষ্কার / সত্যজিৎ রায় ৩৯১

ডুংরির ডায়রি / লীলা মজুমদার ৩৭৫

তস্করও হয় সাধু / সুধাংশু কুমার দত্ত ১০২৫

৩৪৫ আপ প্যাসেঞ্জার / পরেশ দত্ত ৯২৩

তুলনা / কালিদাস রায় ৩৭৪

ত্রিপুর / উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ২৮৪

থার্টিন আপ ঝমঝমা এক্‌স্‌প্রেস / শিশির কুমার মজুমদার ১৩০, ২৩৬, ৩১৬, ৬৭৪, ৭৯১, ৮৪১

দাদুভাইয়ের ছড়া / কালিদাস ভট্টাচার্য ৭১, ১০২৪

দাদুর বিপত্তি / প্রসাদ দাস মুখোপাধ্যায় ৯৯৭

দিউরিতাল / অমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ৩২৯

দিচ্ছে আড়ি / পিনাকী নন্দন চৌধুরী ৬৬১

দিলাম যে পিঠটান / প্রীতিভূষণ চাকী ৪০৯

দীর্ঘজীবেষু / অনিশা দত্ত ৩২৫

দুটো আমি / শুভশ্রী রায় ৯১৪

ছুলিয়া ও বুনো হাতি / তপন কুমার চৌধুরী ১০৭১
দুর্বাসা মুনি / লীলা মজুমদার ৮৫৪
দুলারি / সলিল চট্টোপাধ্যায় ৪৮০
দেয়ালে মুখের আদল / ই. ভি. লুকাস ২৫১
দৈত্যের কেটলী / উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ৬৭১
দৌড়বাজ তীর্থ কুমার ফণি / অরিন্দম দেবনাথ ১০৩৮
ধাঁধা—১৮২, ৩৩২, ৭১৫, ৮০৩, ৯৫১, ১০৩৫, ১১১০
ধাঁধার উত্তর / মায়া গঙ্গোপাধ্যায় ৬৮৩
নটবর বক্সীর গাড়ি / পরেশ দত্ত ৭৬৮
নতুন-পুরনো / জ্যোতিভূষণ চাকী ৬০
নতুন সাজ / কবিতা মুখোপাধ্যায় ৭৫
নন্দ নয় মন্দ / ভবানীপ্রসাদ মজুমদার ৭১৪
নরওয়ে দশের পুরাণ / উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ২৭৭
নামজাদা / সুখেন্দু মজুমদার ৮৫২
নামেতে কি আসে যায় / সুমন্ত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫৫
নিত্যি যাবেন ঝিঙেটোলা / লীলা মজুমদার ১২৪
নিশাচর নেকড়ে / গৌর আদক ১৭২
নীলগিরির ওপারে / অচিন্ত্য দাস ৮৮৭
নীলটুপিওলা-লালটুপিওলা / সুনির্মল চক্রবর্তী ৬১৮
নূতন ধাঁধা / অহিভূষণ চৌধুরী ১০৬৭
নোনা জলের মানুষ খেকো / গঙ্গেশ বিশ্বাস ৬১
ন্যাড়া / হিজবিজবিজ ১৭১, ২৪৭, ২৬১, ৩২৭, ৬৯৫, ৭৫৯, ৮৫৩, ৮৭৯, ৯২৭, ৯৪৪, ১০৩৭
পড়াশুনার গালগল্প / প্রদীপ পারেখ ১১০৬
পতিত ও ম্যানুয়েল পেড্রো / শিশির বিশ্বাস ২৬৩
পথ চলা / সুচিত চক্রবর্তী ৯১৫
পাখীর গান / উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ৮৩৬
পনেরই আগস্ট / অহিভূষণ চৌধুরী ৩১০
পদ্মমণ্ডলের গল্প / নবনীতা দেবসেন ৪৫০
পদ্মার ইলিশ / সুখেন্দু দত্ত ৭৮০
পুজোর চিঠি / সঃ সঃ ৬১০
পুটুস / গৌরী ধর্মপাল ৭৫
পুনর্জন্ম / ক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য ৫৭৬
পুব আফ্রিকায় / ঋতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৭৫
পুরোনতুন / পঞ্চকন্যা ৭২, ১৭৯, ৩৩৩
পুস্তক পরিচয় / কল্যাণী কার্লেকর ৩৩৮, ৮০০, ৯৪২
পৃথিবীর পিতা / উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ৩১
প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর / জীবন সর্দার ১৭৪, ৩৩৫, ৯৪৫, ১১১১
প্রজাপতির পাখা / সুখেন্দু মজুমদার ৫২৩
প্রজাপতিরা আগে গান গাইত / দেবব্রত ঘোষ ২৪৮
প্রথম কবি ও প্রথম কাব্য / উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ৩৩
প্রথম সন্দেশের প্রথম পৃষ্ঠা ১২
প্রফেসর ত্রিশঙ্কুর প্রথম যন্ত্র / শিশিরকুমার মজুমদার ৪৪
প্রেমেন্দ্র স্মরণে / সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৭০৩
ফড়িঙের ঘণ্ট / অমিতাভ ঘোষ ৯৯২
ফাগুন এসেছে / অহিভূষণ চৌধুরী ৯৭৫
ফিঙে / প্রণব মুখোপাধ্যায় ৯৪৩
ফুলপরী / উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ১১৭
বইমেলা / আশিস কুমার মুখোপাধ্যায় ৯২২
বঙ্কারে তোর / কালিদাস ভট্টাচার্য ৪১৮
বড় যদি হতে চাও / সলিল লাহিড়ী ৬১১
বনের খবর / প্রমদারঞ্জন রায় ২১০, ৬৯৬, ৭৮৪, ৯১৮, ৯৮৭, ১০৭৪
বনের সেপাই / ছন্দা বাগচী ৬৯৩
বনের স্বপ্ন / অরুণিমা রায়চৌধুরী ১০৫৫
বন্ধু না-মানুষ / সঙ্কর্ষণ রায় ৬১৯
বর্ষবরণ / দীপ্তি দাশগুপ্ত ৬০
বাঘ এবং বাঘা বলাই / কুমার মিত্র ৫৪৯
বাঘের ডাক, হরিণের চোখ / বন্দনা সান্যাল ৫৫৬
বাঘের যদি / সরল দে ৭১৪
বাদলের বাদ্য / শ্রীকর নন্দী ২৬০
বানর রাজপুত্র / উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ৮৩১
বাপরে বাপ / নিখিল তরফদার ৮৯০
বাবার কথা / পুণ্যলতা চক্রবর্তী ১৪
বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্তের মঙ্গল অভিযান / সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ৪২৬
বিজ্ঞানীর ছড়া / অভিজিৎ সেনগুপ্ত ৪৪৯
বিচার / রাধিকারঞ্জন চক্রবর্তী ১০৯৩
বিশ্বকাপের নেপথ্যে / রাজা রায় ১০১
বিশ্বের প্রথম বেলুনযাত্রী / তাপসকুমার ৯৩৫
বুড়ি রাক্ষসী / বিজয় চন্দ্র মজুমদার ৮৩০
বুদ্ধির বাহাদুরি / রাধিকারঞ্জন চক্রবর্তী ৫৬৪
বেনারসী লালের মঘাই পান / সন্তোষ চট্টোপাধ্যায় ৭১৯

বোঝার ভুল / সুখেন্দু মজুমদার ৭৬২

ব্যবসা সমাচার / সুদেব বকসী ৪৭২

ভবম হাজাম / কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৯৭

ভবিষ্যদ্বাণী / সুধাংশুকুমার দত্ত ১৫৮

ভাগ / ভবানীপ্রসাদ মজুমদার ৭৫৮

ভাষার বুজরুকী / প্রতাপাদিত্য পাল ৭৮৩

ভিনদেশী রূপকথার গল্প / মঞ্জিল সেন ১৫০

ভীতু কামা / উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ৯০৪

ভুলে যাচ্ছি / অমলকান্তি ঘোষ ৬৯৪

ভুলো মানুষ / আশিস কুমার মুখোপাধ্যায় ২৪৬

ভূত ঝাড়ানোর গল্প / অশোক মুখোপাধ্যায় ২৩০

ভূতের ওঝা / বিজয় চন্দ্র মজুমদার ৯৯১

ভূতের রাগ / আশিস কুমার মুখোপাধ্যায় ৫৩২

মজন্তালী সরকার / রামগরুড় ৯৫

মজার চিঠি ২৩২

মজার নয় (৯) কি ? / অনিশা দত্ত ১৬

মজার বই / আশিস কুমার মুখোপাধ্যায় ৭৪৩

মন্দ ভাগ্য / সুখেন্দু মজুমদার ২৬০

মৎসকন্যা ও রাজকুমার / প্রশান্ত কুমার মুখোপাধ্যায় ৬২৬

মন্ত্রসিদ্ধি / অনিন্দ্য শঙ্কর রায় ৬৭১

ময়না তদন্ত / ভবানী প্রসাদ মজুমদার ৮৭৩

ময়ূর / বিশ্ব প্রিয় ২২৭

মরুসুন্দরী কুয়েত / মীরা দে ৯২৮

মহাদেবের বিষাণ / রঞ্জন প্রসাদ ৪৮৬

মহাযুদ্ধ / গজেশ বিশ্বাস ৫৬৭

মহিম সান্যালের ঘটনা / সত্যজিৎ রায় ৩৬

মাকড়সার আরো গল্প / ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য ৩০৪

মাকড়সার জাল / ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য ১৬১

মাছিদাদু ও ইন্দ্রনাথ / অরুণ কুমার দত্ত ৫৮১

মামার কাণ্ড / শৈলেনকুমার দত্ত ৭৫৮

মাম্মা / সর্বাণী দাশগুপ্ত ৯৮৬

মালি / সলিল চট্টোপাধ্যায় ৯০৮

মাস্টারি / রঞ্জন ভাদুড়ী ৫৬২

মিঠু আর দৈত্য / রাহুল মজুমদার ৫৭৪

মিথ্যে কথায় সিদ্ধিলাভ / করুণাময় বসু ২৩৫

মুখার্জিদার গল্প / করুণাময় বসু ১০১৭

মোহনের মণ্ডা লাভ / শৈবাল চক্রবর্তী ৫১:

যখন বড় হব / উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ১৯৩

যাযাবর / পূর্বা মাইতি ৫৪৮

যেখানে বাঘের ভয় / তুষার কান্তি বসু ৫২

রথের গল্প / সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫৭

রসিক বামুন / শৈবাল চক্রবর্তী ১০২৮

রহড়ার মহড়ায় / ভবানীপ্রসাদ মজুমদার ৩১৫

রহস্যময় সিন্দুক / সুবীর গুপ্ত ৮৮০

রাগ নেই / অমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায় ৫৬১

রাজা এলেন সগ্‌গ থেকে / হরেন ঘটক ৪১

রাজার হাল / অশোক মুখোপাধ্যায় ৪৬৭

রাবণ / উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ৮২৪, ৮৯৬

রামধনু / জ্যোতিভূষণ চাকী ৩৮৯

রূপকথা / কবিতা মুখোপাধ্যায় ৪৫৬

রূপকথার দেশে / প্রসাদ দাস মুখোপাধ্যায় ৮৮০

রূপান্তর / মীরা বালসুব্রমনিয়ম ৫২৭

রোজগেরে হাতি / প্রদীপকুমার রায় ৫৮৫

লড়াই থামানোর ফ্যাসাদ/সুমন্ত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৯৮

লিখতে চেয়ে / স্বপন কুমার ঘোষ ৫০২

লেখা আছে বইতে / সুবীর গুপ্ত ২৫৬

লোকটা / মহাশ্বেতা দেবী ৩৮০

শক্তির নতুন উৎস সন্ধানে / নিরঞ্জন সিংহ ৩১১, ৭১২

শপথ নিলাম / সুবীর গুপ্ত ৫৬৬

শর্মিলা স্মৃতি পুরস্কার প্রতিযোগিতা ১০৪, ১১০৭

শাইলকের শহরে / ইন্দ্রাণী হালদার ১০১০, ১০৮৮

শারদীয়া ছড়া / ভবানীপ্রসাদ মজুমদার ৪২৫

শিবুদার চতুর্থ বিস্তার / লীলা মজুমদার ২১৬

শিয়াল / বিশ্ব প্রিয় ৯৫২

শিপ্রা বসু স্মৃতি প্রতিযোগিতা ৬৪৭

শীত এলো / সুখেন্দু মজুমদার ৯২২

শুক পাখী / উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ১০৮৪

শুম্ভ-নিশুম্ভ / উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ৩৭২

শেয়াল রাজা / উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ৮৩৭

শ্যামাকান্ত / রাধিকা রঞ্জন চক্রবর্তী ৯৩৮

শ্রীমান হিমু ও গোদা / পরেশ দত্ত ১৪১

সত্যি-মিথ্যা / শিশির কুমার মজুমদার ৪১১

সত্যি-সত্যি / করুণাময় বসু ১০৭০

সনডে / অশোক মুখোপাধ্যায় ৫৭

সন্দেশ / বাণী রায় ৫৬২
সন্দেশ সম্পাদক উপেন্দ্রকিশোর / নলিনী দাশ ২৭
সন্দেশের কথা / উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ১৩
সন্ধ্যা / রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ৫১৩
সম্পর্কের সুতো / ভবানীপ্রসাদ মজুমদার ৯৮৬
সংবাদ / উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ১২৩, ২৮৩, ২৮৯, ৬৭০
সাগর কেন লোনা / উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ২৮২
সাত পেয়ে জন্তু / উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ৭৪৮
সাত রাজ্যির মজা / নলিনী দাশ ১৬৭
সাধারণ বুদ্ধি / পলাশ বরন পাল ৯৩৩
সুকুমার রায় / প্রবোধ নাথ ৯৮৬
সুবুদ্ধির বুদ্ধি / আদিনাথ নাগ ৭৬০
সূর্য্যের সাজা / উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ১০৫৯
সূক্ষ্ম ব্যাপার / শৈলেন কুমার দত্ত ৭৪
সেরা, কিন্তু / আশিস কুমার মুখোপাধ্যায় ১৭৩
সে এসেছে / কালিদাস ভট্টাচার্য ৯২৬
সোনা / গৌরী ধর্মপাল ২৩৩
স্বপ্নলোকে / সুখেন্দু মজুমদার ৬০
স্বাভাবিক / হাসিরাশি দেবী ৬৭
হরিণ / বিশ্ব প্রিয় ৮৬
হংসাবেনের পাক প্রণালী / মীরা বাল সুব্রমণিয়ন ১০০২
হাড়গিলা রাজা / উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ২৮৩
হাঁড়ি চাচার হাঁড়ির খবর / রাহুল মজুমদার ৮৮
হাড়ের গুণ / কালিদাস রায় ৬৬৬
হাত পাকাবার আসর ১৮৩, ৩৪৫, ৭৩০, ৮১১, ৯৫৯, ১০৪৫, ১১১৯
হাতি / বিশ্ব প্রিয় ১৩৯
হাতিতে হাঁড়িতে মিটে গেল / সুব্রহ্মনিয়ম কৃষ্ণমূর্তি ৫৬০
হাসিকান্না হীরেপান্না / ভবানী প্রসাদ মজুমদার ১০৮৭
হাসির গল্প / উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী ১০৫৮, ১০৬১
হাণ্টার সাহেবের পদক / প্রণব মুখোপাধ্যায় ৯৯৩
হান্স ও পারকির গল্প / রাজা রায় ৫২৪
হারিয়ে যাওয়া খেলা / রেবন্ত গোস্বামী ৭৯
হাসব কেন ? / অনিল কুমার দাস ১৪৭
হিজ মাস্টার্স ভয়েস / তাপস কুমার ১০৩১
হুড়ুক বাজ সিং / উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ৯০১
হ্যাটট্রিক / আশিস কুমার মুখোপাধ্যায় ১০৭৩

পুরনো সন্দেশ নতুনের চেয়েও মিষ্টি

ফুরিয়ে যাবার আগে তাড়াতাড়ি কিনে নাও

সম্পূর্ণ বছর	বাঁধানো	সাধারণ	রেজিঃ ডাকে
১৩৯৩ একমাস নেই	২০·০০	১৫·০০	+ ৮·০০
১৩৯৪	৩০·০০	২৫·০০	+ ৮·০০
১৩৯৫	৩৫·০০	৩০·০০	+ ৮·০০
শারদীয়া সংখ্যা—১৩৯৫		১২·০০	+ ৬·০০

ডাকমাশুল ও রেজিঃ খরচ সহ অগ্রিম টাকা পাঠালে রেজিঃ ডাকে বই পাঠিয়ে দেব। একাধিক বই সকসঙ্গে নিলে রেজিঃ খরচ একবারই লাগবে।

জলাতঙ্ক রোগ খুবই মারাত্মক–কিন্তু আপনি তা প্রতিরোধ করতে পারেন

কি ভাবে এই রোগ হয়?

- ক্ষিপ্ত পাগলা পশু – বিশেষ করে কুকুর কামড়ালে এই রোগ হয়ে থাকে।
- একবার এই রোগে আক্রান্ত হলে তা মৃত্যু ঘটাতে পারে কারন জলাতঙ্ক রোগ সারাবার কোন চিকিৎসা হয় না।

প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা

- জলাতঙ্ক রোগ কিন্তু প্রতিরোধ করা যায়। সমস্ত পোশা কুকুরদের এই রোগ প্রতিরোধকারী টীকা দিয়ে নেবেন।
- রাস্তার বেওয়ারিশ কুকুরদের ধরতে এবং সরিয়ে ফেলতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করুন কারন বেওয়ারিশ কুকুরেরা সাধারণতঃ ক্ষিপ্ত ও পাগল হয়ে পড়ে এবং তাদের মাধ্যমে গৃহপালিত কুকুরদের এই রোগ সংক্রামিত হয়।
- যদি আপনাকে কুকুরে কামড়ায় তবে ক্ষত স্থান সাবান ও জল দিয়ে ভাল করে ধুয়ে নেবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নিকটবর্তী হাসপাতালে চিকিৎসার জন্যে যাবেন।

জলাতঙ্ক রোগ প্রতিরোধকারী টীকা

- ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী জলাতঙ্ক রোগ প্রতিরোধকারী টীকা নিন।

সেন্ট্রাল হেলথ এডুকেশান ব্যুরো
ডি. জি. এইচ. এস. কোটলা রোড, নিউ দিল্লী।

davp.83/782 Ben

নিউস্ক্রিপ্টের ছোটদের অসাধারণ বই

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী—পৌরাণিক কাহিনী	১০·০০
পুণ্যলতা চক্রবর্তী—ছেলেবেলার দিনগুলি	৮·০০
লীলা মজুমদার—উপেন্দ্রকিশোর	৮·০০
মাকু	৭·০০
আজগুবি	১০·০০
সত্যজিৎ রায়—প্রোফেসর শঙ্কু	২০·০০
একেই বলে শুটিং	১২·০০
শিশিরকুমার মজুমদার—দালাং মিশনের ঘণ্টা	৮·০০
তুফান দরিয়ার পরাণ মাঝি	১২·০০
নলিনী দাশ—হাতীঘিসার হানাবাড়ি	১২·০০
রানী রূপমতীর রহস্য	১০·০০
মঞ্জিল সেন—গঙ্গোত্রী রহস্য	৬·০০
জ্যোতিরিন্দ্রমোহন জোয়ার্দার অনূদিত	
স্যার আর্থার কোনান ডয়েল—ম্যারাকট ডীপ	১০·০০
রেবন্ত গোস্বামী—বাবলা ফুলের গন্ধে	১০·০০
নিরঞ্জন সিংহ—মহাকাল	১০·০০
প্রণব মুখোপাধ্যায়—নীল শ্যাওলার খোঁজে	৫·০০
বুড়ির ঝুড়ি	৫·০০
ভবানী প্রসাদ মজুমদার—মিঠে কড়া পশুর ছড়া	৫·০০
মিঠে কড়া খেলার ছড়া	২·০০
মিঠে কড়া ভূতের ছড়া	২·০০
নাম তাঁর সুকুমার	৪·০০
শিশির বিশ্বাস—বাঘবন্দী মন্তর	১০·০০
সেরা ভূতের গল্প সংকলন—অশরীরীর আসর	২৫·০০
সম্পাদনা: লীলা মজুমদার, নলিনী দাশ ও সত্যজিৎ রায়	
কমিক স্ট্রিপ—টোটোর অ্যাডভেঞ্চার	
গল্প—নলিনী দাশ, ছবি: প্রশান্ত	৪·০০
দানোর সন্ধানে	
গল্প: মঞ্জিল সেন, ছবি: সিদ্ধার্থ	৩·০০

নিউস্ক্রিপ্ট—এ ১৪, কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলিকাতা-৭০০ ০০৭

সন্দেশের গ্রাহকেরা এখন নিউস্ক্রিপ্টের বই-এ ২৫% বিশেষ কমিশন পাচ্ছে

Regd. No. WB/SC-102 : SANDESH April Price 4·00

মে মাসের প্রথমেই বেরোবে

বিশেষ নববর্ষ সংখ্যা

বৈশাখ ১৩৯৬ — মে-১৯৮৯

এই সংখ্যায় থাকবে

★ লীলা মজুমদারের অসাধারণ সরস গল্প।
★ সত্যজিৎ রায়ের চমকপ্রদ নতুন গল্প।

অনেকগুলি উপভোগ্য গল্প লিখেছেন

নলিনী দাশ, শিশির কুমার মজুমদার, মঞ্জিল সেন,
অজেয় রায়, শৈবাল চক্রবর্তী, গঙ্গেশ বিশ্বাস
প্রমুখ অনেক জনপ্রিয় লেখক

★ পুণ্যলতা চক্রবর্তীর কথা—কল্যাণী কার্লেকর
★ জন্মশতবর্ষে চার্লি চ্যাপলিনের কথা—সন্দীপ রায়

পুরোন সন্দেশ থেকে বাছাই করা লেখা ও ছবি
অ-নে-ক গল্প-ছড়া-কবিতা-প্রবন্ধ-খেলা-মজা
শুরু হচ্ছে।

শচীন্দ্রনাথ বসুর রোমাঞ্চকর বিজ্ঞান ভিত্তিক উপন্যাস

'ওরা কারা?'

তাছাড়া—অসাধারণ দুটি পুরস্কার প্রতিযোগিতা

★ গ্রাহক না হয়ে থাকলে তাড়াতাড়ি গ্রাহক হও।
★ খুব তাড়াতাড়ি নতুন বছরের চাঁদা পাঠাও
★ অনেক অনেক নতুন গ্রাহক সংগ্রহ কর
★ এজেন্টরা তাড়াতাড়ি যোগাযোগ করুন।

কালিকা প্রিন্টার্স এ্যাণ্ড বাইণ্ডার্স, ১০১বি, কেশব চন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলি-৯ দ্বারা
সন্দেশ কার্যালয়—১৭২ ৩ রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯ হইতে
অশোকানন্দ দাশ কর্তৃক প্রকাশিত।